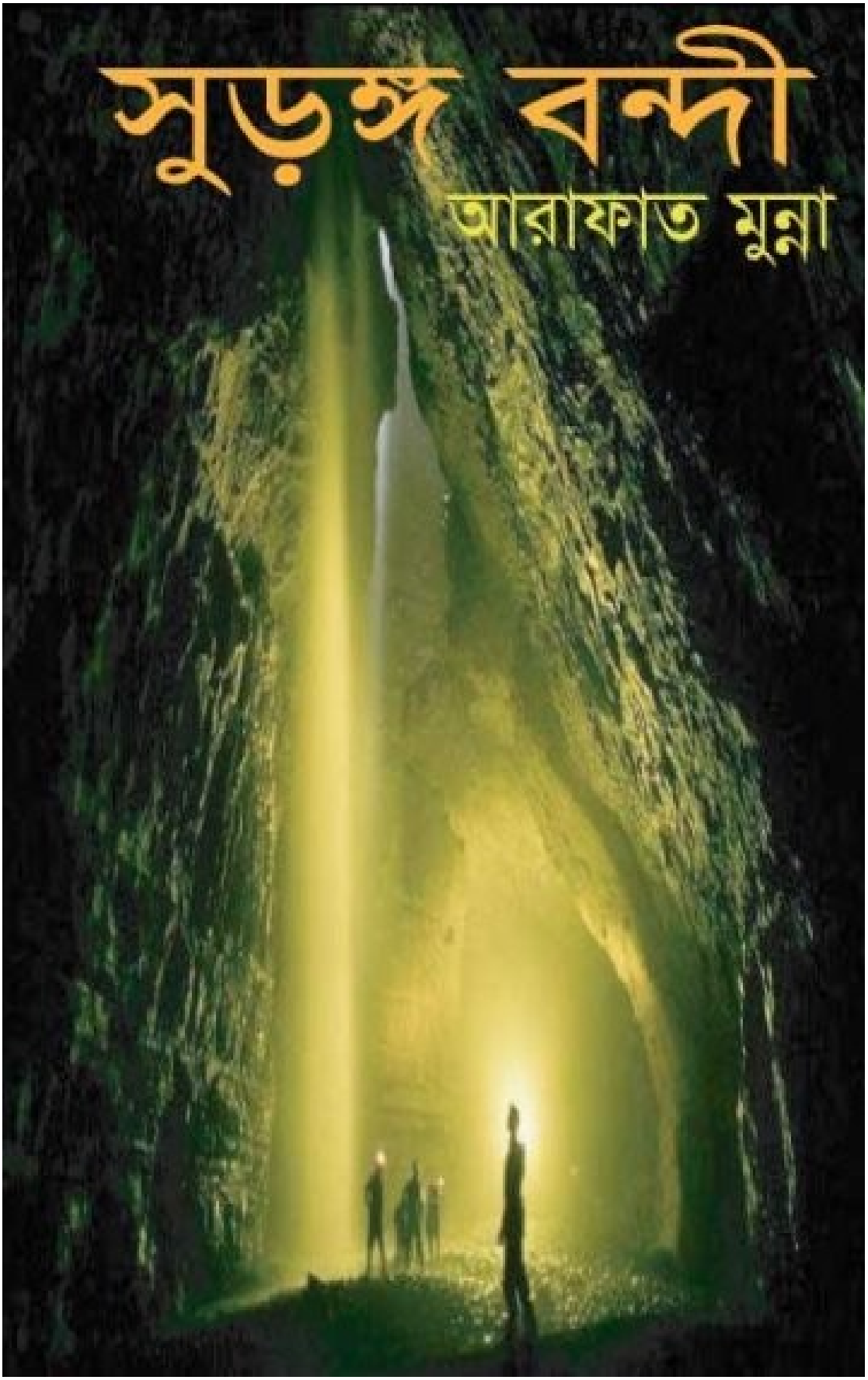
সুড়ঙ্গ বন্দী
আরাফাত মুন্না

এক

লাজ-লজ্জা, অপমানহীন একটা মানুষ ভাবা যায়! আমাদের ক্লাসে রনিটা ঠিক তেমন, হোমওয়ার্ক করে আনেনি বলে বিষু স্যার ওকে পা ওল্টিয়ে মাথা নিচ দিয়ে দেয়ালে আটকে থাকার শাস্তি দিয়েছেন। এই শাস্তির পরও ওর কোন ভাবান্তর নেই। ক্লাসে বসে আমাদের সবার যেখানে হার্টবিট শুরু হয়ে গেছে (কখন কার ভাগ্যে এই শাস্তি জোটে) ও সেখানে পা নাচিয়ে বান্দর নাচের মতো আমাদের হাসানোর চেষ্টা করছে। ওর উপর রাগটা কী পরিমানে উঠছে স্যার না থাকলে বুঝিয়ে দিতাম!

বিষু স্যারকে আমরা যমের মতো ভয় পাই। স্যারের ক্লাসে একটু অমনোযোগী হলেই ধরা। স্যার যাদু জানেন কিনা জানি না, কোন ছেলে বা মেয়েটা তার পড়ায় মন দিচ্ছে না সাথে সাথেই বুঝে ফেলেন। সেদিন আমি ক্লাসে বসে জানালার দিকে তাকিয়ে 'শরৎ চন্দ্রের' বেচারা দেবদাসকে নিয়ে ভাবছিলাম। কাল রাত্রে সদ্য উপন্যাসটা শেষ করেছিলাম কিনা। এমন সময় দেবদাসের পন্ডিতের মতো বিষু স্যার আমার কান টেনে বললেন, "হতচ্ছাড়া কোথাকার! পড়ায় মন না দিয়ে কার কথা ভাবা হচ্ছে? হু!"

আমি থত্মত খেয়ে বললাম, "সত্যি বলছি স্যার, কোন কারো কথা ভাবিনি!"
এতে হাসার কি আছে আমার জানা নেই কিন্তু পুরো ক্লাস হেসে তোলপার হয়ে গেল। রাগে আমার গা ঝা ঝা করতে লাগল। ভাগ্যিস, স্যার চুপ করতে বললেন নইলে নিজেই গলা ফাটিয়ে চুপ করাতাম। সামান্য এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমার কপালে জুটল, স্কুল মাঠে মাথা পায়ের নিচে দিয়ে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা। সেদিন আমার কি অবস্থা হয়েছে বলার মতো নয়! সিনিয়র জুনিয়র সবাই আমায় দেখে মুখ টিপে হেসেছে। এখনো দেখা হলে কেউ কেউ সে কথা স্মরণ করে হাসে।

সেদিন থেকে ভাবলাম, স্যারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব। নজরুল যেমন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কবিতা লেখা শুরু করেছিল আমিও তেমনি স্কুল ম্যাগাজিনে স্যারের বিরুদ্ধে আগুন-জ্বালা সব কবিতা লেখা শুরু করলাম। তবে কবিতায় স্যারের নাম উল্লেখ করার সাহস পাইনি। ইনডাইরেক্টলি লিখেছি, উপমা দিয়ে। স্যার বুঝতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। মাথাধরা অংকের টিচার, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই তো?

আমার কবিতার কারণে কিংবা অন্য কারণে জানি না আমাদের স্কুলে আত্মস্বীকৃত সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত 'লতফ শাহম' স্যার আমায় ডেকে পাঠালেন। স্যারের নাম দেখে চমকে উঠার কিছু নেই। আসলে স্যারের আসল নাম "লতিফুজ্জামান শাহ আলম"। কিন্তু সাহিত্যিকদের নাম নাকি কাব্যিক হতে হয় তাই স্যার পরিবর্তন করে 'লতফ শাহম' রাখেন। স্যারের ভাব ভঙ্গিতেও পুরো কবি। সাদা পাঞ্জাবী, একটা চটের ব্যাগ আর গরম ঠান্ডা যাই হোক একটা চাদর সবসময় শরীরে জড়িয়ে রাখেন। স্যারের রুমে যেতেই আমায় সাদরে বললেন, "এসো হে এসো, হৃষ্ট চিত্তে বসো!"
তারপর স্যার আতঁকে উঠে বললেন, "একি! তোমার চেহারায় তো কবিত্বের চিহ্ন নেই। মনের ভিতর ভেজা আবেগটুকুও তো দেখতে পাই না।"
চেহারায় কবিত্বের চিহ্ন ভেসে উঠে কিনা আমার জানা নেই। আর আবেগ যে শুধু ভেজা হবে তার শর্তই বা কে দিয়েছে? গরম, ঠান্ডা, ভেজা, নাতিশীতোষ্ণ ও হতে পারে।

স্যারের কথার কি উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে বললাম,"স্যার আমি কিন্তু আপনার কবিতা খুব পছন্দ করি। " কথাটা বলে বোধ হয় ভুলই করলাম।
স্যার বেশ ভাব নিয়ে বললেন, "সেটা তো করতেই হবে। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান বলতেই তো আমরা। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আর রবিঠাকুরের যুগ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। আমার কাব্যের উপমা, ছন্দ, অলংকার সেসব থেকেও নাকি অনেক উঁচু মানের বলে, অনেক পন্ডিত মনে করেন। "
পন্ডিতগুলো যে কে একটু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সাহস পেলাম না।
তারপর আবার বললেন, "তুমি কি আমার 'নোনা জলে পদ্ম' কবিতাটা পড়েছ? অসাধারণ এক কবিতা। বাংলা সাহিত্যে সোনার তরীর পরে স্থান দেয়া যায়। তোমাদের মত বালকদের নিয়ে 'গাঁধাবেলা' নামে একটা কবিতা লিখেছিলাম। দাঁড়াও শুনাচ্ছি-

মস্তিষ্কের আহ্বানে
ছেলেগুলো হচ্ছে গাঁধা,
গাঁধাবেলার অনন্ত সুপ্রাতে
পরীক্ষার খাতা সাদা।

কি কেমন হল?বাংলা সাহিত্যে এমন কয়টা কবিতা আছে, হ্যাঁ?"
আমি খুব জোড় দিয়েই বললাম,"একটাও না। বাংলা সাহিত্যে এত নিপাতে যায়নি !"
শেষ কথাটা বোধ হয় লক্ষ্য করেননি। তাই খুশি হয়ে গেলেন।
স্যারের এমন উদ্ভট কবিতা শোনার চেয়ে মুক্তি পেলে বাঁচি।
তাই স্যারকে বিনীতভাবে বললাম,"আমায় কি জন্য ডেকেছেন স্যার?"

এবার বোধ হয় স্যারের ভাব একটু ভাঙ্গল। তারপর গলা খেকড়ে বললেন,"হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তুমি স্কুল ম্যাগাজিনে যে সব কবিতা লিখেছ তা কবিতা না বলে কপিতা বলা ভাল। বিদ্রোহী কবি মানে নজরুল, শেলী। ওদের ভাব , বাক্য নকল করার কোন মানে হয় না। নকল করে কবি হওয়া যায় না, বুঝলে বাছা। সৃজনশীলতাই হচ্ছে কবিতার মূল শক্তি।এই দেখনা আমাকে,সৃজনশীলতার কতো উদাহরণ রেখে যাচ্ছি। আর তুমি তো আমার কবিতা পড়েছ, সৃজনশীলতার অনন্য উদাহরণ।"
আমার তখন ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করি, স্যার আপনি নজরুল আর শেলীর কয়টা কবিতা পড়েছেন? তবে এটা ভেবে বেশ গর্ব হল, আমার কবিতা নজরুলের মতো।
আসার সময় স্যার ডাইরীর একটা পাতা ছিড়ে নিজের স্বাক্ষর দিয়ে বললেন, "আমি জানি তুমি আমার অটোগ্রাফ চাইতে। মুখ ফুটে বলতে পারছ না। তাই নিজেই দিয়ে দিলাম। তাছাড়া অন্য সময় আসলে নাও পেতে পার। জানই তো কবিদের আশেপাশে ভিড় লেগেই থাকে।"

দুই

স্যারের রুম থেকে বেরিয়ে মেজাজটা পুরো বিগড়ে গেল। স্যারের কথাবার্তায় কবিতা জিনিসটা নিয়ে আমার ভেতর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ শুরু হয়ে গেল। কবি হিসেবে জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন ছিলেন ভাবতে লাগলাম। ভেবে পেলাম যে, আধুনিক কালে কেউ কবি হতে পারে না, যারা এদিকে একটু-আধটু এগিয়ে যায় তারা মূলত ভাবের কবি। সুকান্ত, নজরুল, জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এরাই মূলত আসল কবি। কবিতার নিগূঢ় কথা ভেবে নিজের মনকে কুসাহিত্য থেকে রক্ষার চেষ্টা করলাম।

সাহিত্যের এপাশ-ওপাশ ভেবে আমি যখন সাড়া হচ্ছি তখন স্কুলের বারান্দায় আমার সাথে দেখা হল পেত্নির চেয়েও ভয়ঙ্কর নিশির সাথে। পেত্নির মতো ওর কোন স্বভাব ছিল কিনা জানি না তবে আমার পেছনে লেগে থাকত বলে ওর সাথে দেখা হওয়া মানে ভূত পেত্নির সাথে দেখা হয়েছে বলে মনে হতো। স্থুলের অন্য কোন ছেলের সাথে ওর কোন দ্বন্দ বিরোধ নেই, যত ঝামেলা আমার সাথে। আমিও তাই এ মেয়ের পাশ কেটে চলতাম । কিন্তু আমি যত এর পাশ কাটি এ তত আমার পাশে আসে।

আমাদের স্কুলে ও মাত্র নতুন এসেছে, তিনমাস হলো। এর ভিতরে পুরো স্কুল মাথায় করে নিয়েছে। সকল স্যারের প্রিয় ছাত্রী এই পেত্নি নিশি। ক্লাসেও স্যাররা এই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে চিনে বলে মনে হয় না। কিছু হলেই স্যার বলবে,'নিশি মা, একটু এদিকে আয় তো'। 'নিশি, এই ছেলেগুলোর পড়া ধরতো।' আমরা চার বছর এই স্কুলে পড়েও স্যারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলাম না, আর ও তিনমাসেই স্যারদের মধ্যমনি হয়ে বসেছে! এই মেয়ের জন্য আমার স্কুল লাইফ পুরো বরবাদ হওয়ার অবস্থা। কেউ কেউ ভাবছে ও নাকি আমার প্রথম স্থান কেড়ে নিবে। অবশ্য সবার ভাবনাটাকে আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। আমার নিজের ভিতরও এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, এ মেয়ের দ্বারা সব সম্ভব।

আমার হাতে ছিল সদ্য 'লতফ শাহম' স্যার থেকে প্রাপ্ত তার বিনামূল্যে অটোগ্রাফ। ছিড়ে ফেলতেও পারিনি তাতে ঝামেলা যে আরো কতগুন বাড়বে সে আমার ভাল করে জানা আছে। নিশিকে সামনে পেয়ে আমার বুকটা ছেদ করে উঠল। স্যারের অটোগ্রাফ লুকিয়ে কোন রকমে ওর পাশ কাটানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু এ মেয়ে আমায় ছাড়ল না। জিজ্ঞাসা করল, "দেখি তোর হাতে কি?" আমি পাত্তা না দেয়ার ভান করে বললাম,"কিছু না।" মেয়েটা এমন পাজি ঠুস করে টান দিয়ে আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিল। তারপর 'লতফ শাহম স্যারের অটোগ্রাফ', 'লতফ শাহম স্যারের অটোগ্রাফ' বলে চেঁচাতে লাগল। লজ্জায় আমার পুরো শরীর ঘেমে গেল। কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করলাম কিন্তু ওর থেকে কাগজটা উদ্ধার করা সম্ভব হল না।

কিছুক্ষণের ভিতর পুরো স্কুলে ছড়িয়ে গেল আমি 'লতফ শাহম' স্যারের অটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্য স্যারের দ্বারস্থ হয়েছি। পুরো ক্লাসের ভিতর ছিঃ ছিঃ রব পড়ে গেল। সদ্য কবিত্ব পাওয়া মজনু এসে আমায় বলল, "তুই লতফ শাহ স্যারের অটোগ্রাফ না নিয়ে আমার অটোগ্রাফ নিলে তোর অটোগ্রাফ সংগ্রহশালা আরো সমৃদ্ধ হতো।"

মজনুর বাচ্চাকে থুক্কু মজনুর বাপের বাচ্চাকে কি বলব ভেবে পেলাম না। সমস্ত শরীর রাগে ঝা ঝা করতে লাগল। আজ ঐ মেয়েকে কিছু না বললে পুরুষ সমাজের উপর যে কলঙ্ক পড়বে তা হয়ত রামায়ণ দ্বারাও শুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। তাই পুরুষ জাতির মান রক্ষার্থে সংকল্পবদ্ধ হলাম।

ছুটির পর নিশি ওর বান্ধবীদের সাথে যায়। ওদের বাড়ির পথ আর আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথ একই। ভাবলাম, যা সংকল্প করেছি তা চরিতার্থ করতে না পারলে ছেলে হয়ে জন্মানোই বৃথা। তাই সারাদিনের সমস্ত রাগ সাহসে পরিণত করে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম,"তুমি আমার নামে স্কুলে এগুলো রটালে কেন? তোমার সাথে আমার কিসের শত্রুতা?" নিজের সাহস দেখে নিজেই মুগ্ধ হলাম। ভেতর থেকে নিজেকে বাহবা দিলাম, সাবাস বেটা।
আমার এ হুংকানি ভাব দেখে নিশিও কিছুটা অবাক হয়েছে বলে মনে হলো। সে মুখের ভাব পরিবর্তন করে বলল,"যা সত্যি তাই তো বললাম। আর তাছাড়া আমার ইচ্ছে হয়েছে।" শেষ কথাটা শুনে আমার পুরো শরীরে আগুন ধরে গেল। তবু নিজেকে ধরে রেখে বললাম,"ইচ্ছে হলেই সব করবে নাকি?" আমায় ভেংচি কেটে বলল,"হ্যাঁ, ইচ্ছে হলে সব করব।" এ কথা শুনে আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। সমস্ত রাগ শক্তির রূপান্তরের মতো ওর নরম গালে চড় হিসেবে গিয়ে বসল। আমি আর অপেক্ষা না করে বাড়িমুখো হলাম। ওর বান্ধবীরা গালি দিয়ে আমার বংশ উদ্ধার করল। শুধু এটুকু দেখলাম, পেত্নি নিশি গালে হাত দিয়ে মুহূর্তকালের জন্য স্থির হয়েছিল।

বাড়ি এসে উচিত মত একটা কাজ করেছি বলে মনে হলো। এ শাস্তি যে ওর প্রাপ্য ছিল সে নিয়ে আর বিচার বিশেষণ করলাম না। তবে চড়টা কী আমি দিয়েছি নাকি আমাকে দিয়ে কেউ দিয়েছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল। আমার হাত কেমন করে উঠেছিল তা আমার কাছে মহাবিশ্বের রহস্যের মত রহস্যজনক মনে হলো।
মন থেকে রাগ মুছে গেলে মানুষ অনেক কিছু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পারে। আমার অবস্থাও হলো ঠিক তাই। মনের ভেতর কেমন যেন অনুশোচনা হতে লাগল। বার বার মনে হতে লাগল কাজটা ঠিক করিনি। সারাদিন কোন কাজে মন বসাতে পারলাম না। মনটা কেমন যেন আকুলি- বিকুলি করতে লাগল।
বিকেলবেলা তুরাব, অনিক আর স্নিগ্ধদের সাথে ক্রিকেট খেলতে মাঠে গেলাম। খেলাতেও ঠিক মন বসাতে পারলাম না । আগে যেখানে বল করতে নেমে এক ওভারে দুই তিনটা উইকেট ফেলে দিতাম আজ সেখানে এক ওভাবে দিলাম, পাঁচ-পাঁচটা ওয়াইড। ব্যাটিংয়েও ব্যর্থ, দশ রানের বেশি করতেই পারলাম না। সবাই বলল,"কিরে আজ তোর এ অবস্থা কেন? একেবারেই যে পারছিস না।" আমি কোন উত্তর দিলাম না।
রাতের বেলা পড়তে গিয়েও একই অবস্থা হল। বার বার উচ্চস্বরে পড়েই যাচ্ছি কিন্তু মাথায় কিছু ঢুকল বলে মনে হয় না। সামনে বই খোলা রেখে নিশির গালে হাত ধরা সেই স্তম্ভিত মূর্তিটা চোখে ভাসতে লাগল। মনের ভেতর থেকে পেত্নি ভাবটা কেটে গিয়ে সদা হাস্যোজ্জল, সবার সাথে বন্ধুসুলভ একটা মেয়ের ছবি ভাসতে লাগল। ওর সাথে পূর্বেকার ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগল। আর নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হল। কী করব ভেবেও পেলাম না। শুধু নিজেকে শাসন করে বললাম, "একটু না হয় বাদরামি করলই, তাই বলে চড় মারতে হয় নাকি।"

তিন

শুক্রবার দিন। তাই ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরিই হল। বিছানায় বসেই ভাবলাম, নিশির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু ওর সামনে যাওয়ার মত সাহসই আমার নেই। তাছাড়া সে আমায় ক্ষমা করবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। যা রাগি মেয়ে উল্টা-পাল্টা কিছু বললে উত্তরও দিতে পারব না। আর যদি ঝাড়ু কিংবা ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসে তাহলে তো কথাই নেই। প্রেস্টিজ যে কোথায় যাবে, ভাবা যায় ! এ সামান্য ব্যাপার নিয়ে যতক্ষণ ভাবলাম ততক্ষণে হয়ত তিনটা কবিতা লিখে ফেলা যেত। কিন্তু তারপরও কবিতার দিকে হাত বাড়ালাম না।

আমার জায়গায় ফেলুদা থাকলে নিশ্চয় নতুন একটা আইডিয়া বের করে ফেলত। অবশ্য ফেলুদা আমার মতো বোকামিটা করতো না নিশ্চয়। ফেলুদার মাথার দুই একটা বুদ্ধিও যদি আমার মাথায় আসত তাহলে হয়ত অনেক বিপবের সমাধান করা যেত। আর টেনিদা হলে নিশ্চয় বিজ্ঞের মতো একগাদা উক্তি ছাড়ত। বন্ধুদের ভিতর অনিক একমাত্র আমার বাড়ির পাশে থাকে। বলতে গেলে, ও আমার সকল কাজের সঙ্গী। বিজ্ঞানের সকল বিরক্তিকর বিষয়ে ওর আগ্রহ। নতুন কোন যন্ত্র দেখলে সেটার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব খুলে কী আছে দেখতে চায়। আমি আর অনিক মিলে একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছিলাম। যেটা কুকুরের পাগলামি রোগ নিরাময় করে। আমাদেও গাঁয়ের হাসু পাগলার পাগলামি ভালো করার জন্য ওষুধটা তৈরি করেছিলাম। কিন্তু ওষুধটা গেলানোর পর তার পাগলামি আরো বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের দেখলেই তেড়ে আসে।কিন্তু হাসু পাগলার কুকুরটার পাগলামি ঠিকই ভালো হয়েছিল। গতবারের আন্তঃজেলা বিজ্ঞানমেলা প্রতিযোগিতায় আমাদের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটা দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। বর্তমানে আমরা 'লাফিং গ্যাস' নিয়ে কাজ করছি। গরু-ছাগল তো হাসে না, লাফিং গ্যাস দিয়ে এদের হাসানো যায় কিনা ভাবছি।

অনিক যে শুধু বিজ্ঞানের কলকব্জা আর থিওরির হিসাব রাখে তা নয়। সব দিকেই ওর খেয়াল থাকে। আমি ভাবি স্কুলের অনেক ব্যাপারই ও জানে না কিন্তু গল্প শুরু করলে উল্টো আমায় আরো বেশি শুনিয়ে দেয়। তাই নিশির ব্যাপারে পরামর্শ নিতে অনিকই একমাত্র সহায়। এছাড়া আর কারো কাছে শুভবুদ্ধি পাব বলে মনে হল না। একটা শার্ট পড়ে তাই অনিকদের বাড়ি চলে এলাম।

অনিকের ঘরে গিয়ে দেখলাম ও একটা পাথর নিয়ে কী যেন করছে। একবার পাথরটাকে উপরে মারছে তারপর সেটা সোজা এসে ওর মুখে পড়ছে। ওর এই ছেলেখেলার কোন মানে বুঝলাম না।

তাই জিজ্ঞেস করলাম,"পাথর খাওয়ার প্রাকটিস করছিস নাকি?"

আমায় দেখে ও মুখ থেকে পাথরটা বের করে বলল,"কৃষগহ্বর নিয়ে ভাবছি। কৃষ্ণ গহ্বর জিনিসটা আসলে খুবই জটিল। সবই আলোর খেলা। কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোন বস্তু ফিরে আসে না কেন, ওটাই মাথায় ঢুকছে না। মনে কর, কোন একটা বস্তু শক্তির প্রভাবে....."

আমি ওকে থামিয়ে বললাম, "থাক, থাক আর বলতে হবে না। এগুলো আপাতত আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"ও হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়েছে। জানিস, নিউটনের আগে মহাকর্ষ বল সম্পর্কে ইবন হাইসাম ধারণা দিয়েছিল। দেখ, বিজ্ঞানের ইতিহাসকে কেমন, করে বিকৃত করা হয়েছে। বীজগনিত, ভূগোল, রসায়ন আর পদার্থ বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের কথা শুনলে পুরো টাকশি খাবি। পশ্চিমা শয়তানগুলো সব

পাল্টে দিয়েছে। নিম গাছ প্রথম জন্মেছে আমাদের দেশে অথচ এর পেটেন্ট নেয় ওরা। ভাবতে পারিস, কত অবিচার।"
ওর কথাগুলো চিন্তা করার মতো হলেও বর্তমানে আমার মস্তিষ্কে কোন প্রভাব পড়ল না। কবিতার আলোচনা হলেও হতো তাহলে বেশ ভাব নিয়ে কালিদাসের 'মেঘদূত' কিংবা কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' থেকে কিছু উচু দরের কথা শুনিয়ে দিতাম। শেষে বাধ্য হয়ে বললাম, তোর এই তত্ত্বালোচনা পরে হবে। আগে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। কাজ না অবশ্য, ঝামেলার সমাধান।
"ঝামেলাটা কী বলতো? নিশ্চয় নিশির সাথে।"
"নিশির সাথেই যে ঝামেলা কেমন করে বুঝলি?"
"এতো সোজা ব্যাপার। মনে কর বিজ্ঞানের আপেক্ষিকতার আড়ালেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। আপেক্ষিকভাবে কোন বস্তুকে ...."
"তুইতো খুব ঝামেলা শুরু করেছিস। কিছু বলতে গেলেই শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান। তোর মাথায় এছাড়া অন্য কিছু নেই।"
"এটা তুই কি বললি? মানুষের সমস্ত জীবন জুড়েই তো বিজ্ঞান। আইনস্টাইন, নিউটন কিংবা এডিসনের মতো বিজ্ঞানীরা...."
"আবার!"
"ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। নিশির কোন নাম্বার চাই তো? এই নে। সামনে যাওয়ার সাহস না থাকলে তাহলে মেসেজে সরি বলতে পারিস। মেয়েদের সাথে ঝামেলা করে লাভ নেই। উল্টো ফ্যাসাদে পড়বি। তারচেয়ে বন্ধুত্ব করে ফেল, সেটাই ভাল।"
"শালা, তুই সব জেনেও ঢং করছিলি কেন? আর তোকে এগুলো কে বলল?"
"কে আর বলবে, নিশি থেকেই সব জেনেছি। তুই না বললে কি হবে নিশি ঠিকই আময় ফোন করে সব বলেছিল।"
"করেছিল বুঝি? আমায় নিয়ে কিছু বলেছে?"
"না ,তেমন কিছু বলেনি।"
"তাই । কিছুই বলেনি না?"
নিশির ফোন নাম্বারটা নিয়ে সোজা আমার ঘরে চলে এলাম। মোবাইল নিয়ে বসলাম মেসেজ লিখব বলে। কিন্তু হায়, মেসেজে কী লিখলে যে ভাল হবে তাই বুঝে উঠতে পারলাম না। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর লিখলাম-"কাল যে ব্যাপারটা ঘটেছিল তার জন্য আমি নিতান্তই দুঃখিত এবং শঙ্কিত। কাজটা আমার করা উচিত হয়নি। তাই বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থী -শিশির।" তারপর সেন্ড করে দিলাম নিশির নাম্বারে। উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম, উত্তরের আশায়। অনেকটা তীর্থের কাকের মত।

কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো তবু মেসেজের কোন উত্তর এল না। সারাদিন মনে হল এই বুঝি মেসেজ এলো তাই মোবাইলের কোন সংকেত ছাড়াই ইনবক্স ঘাটতে হল। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন উত্তর না পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। যশপাড়ার সাথে আজ টুনামেন্টে খেলার কথা ছিল। মোমেনের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও খেলতে গেলাম না। নিজেকে স্বান্তনা দিয়ে বললাম, "ইস উত্তর না দিলে মনে হয় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! দোষ করেছি ক্ষমা চেয়েছি, তাতেও মান না ভাঙ্গলে আমি কি করব।" এসব ভেবে পরক্ষণেই আবার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ব্যাপারটা কাটার মত বিধতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলা আমি যখন বার বার পড়ার চেষ্টা করেও পড়তে পারছিলাম না তখন আমার ছোটবোন মিশু এসে বলল,"ভাইয়া, তুই কি ছেকা খেয়েছিস?"
"ছেকা খেয়েছি মানে?"
"জানিস ভাইয়া, আজ নুসরাত বলেছে প্রেমে ছেকা খেলে নাকি মানুষের মন খারাপ থাকে। তোর মন খারাপ তো তাই বললাম।"
"বেশ তো কথা শিখেছিস। এমন লাথি মারব দাঁতগুলো পড়ে এই বয়সে বুড়ি হবি। পাজি মেয়ে। ভাল কথা শিখতে পারিসনে।"
আমার বকুনি খেয়ে মেয়েটা একবার ভেংচি কেটে রুম থেকে চলে গেল। ছোট ভাই বোনের জ্বালাতন যে কত সে আমি হারে হারে বুঝি। এই মেয়ের আমার প্রতি টান থাকলেও উচিত কথা বলতে আমায়ও ছাড়ে না। আমার ছোট ভাই হৃদয়টা আমার সকল গোপন কথা বাবা-মার কাছে ফাস করে দেয়।

রাত দশটায় আব্বু যখন আমার মোবাইলের কললিস্টে মেয়েদের নাম্বার খোঁজায় ব্যস্ত, সে সময় একটা মেসেজ এল। কে পাঠাল জানি না, তারপরও মনে হল নিশি। আব্বুর হাতে মোবাইল তাই আত্মারাম খাঁচাছাড়া। পুরোদমে আল্লাহ-নবীর নাম জপে গেলাম। কিন্তু আব্বু তেমন কিছু না বলে আমার হাতে মোবাইলটা দিয়ে বললেন,"নিশি মেসেজ পাঠিয়েছে।" আমি শুধু চেয়েই রইলাম, মেসেজটা খোলা হয়নি বলে হাপ ছেড়ে বাঁচলাম। আব্বু আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "নিশি কে রে? এ নামে আগে তো তোর বন্ধু শুনিনি।"
আমি আমতা আমতা করে বললাম, "স্কুলে নতুন এসেছে তো।"
আব্বু কেমন যেন সন্দেহের সুরে বললেন, "নাম শুনে তো কেমন যেন মেয়ে মেয়ে লাগে । কী অদ্ভুদ! ইদানিং নাম শুনে ছেলে মেয়ে আলাদা করা যায় না।" বলতে ইচ্ছে করছিল নিশি ছেলে নয় মেয়েই। কিন্তু নিজের বিপদ কী নিজেই ডেকে আনতে পারি বলো?

আব্বু চলে যাওয়ার পর সাথে সাথেই মোবাইলটা নিয়ে বসলাম। ইনবক্স ওপেন করে মেসেজটা পড়তেই থ বনে গেলাম। এতে লেখা আছে,- "শালা, থাপ্পড় মারবি তো আস্তে দিলেই হয়। অবশ্য তোর মতো চ্যাংড়ার হাতে যে এত শক্তি, থাপ্পড়টা না খেলে বুঝতাম না। বন্ধুদেরে ভিতর ক্ষমা কিসের রে? মারব চাট্টি। ও হ্যাঁ, মোবাইলটা আম্মুর তো তাই উত্তর দিতে দেরি হল। রাগ করিস নে- নিশি।" আমায় চ্যাংড়া বলেছে তো কী হয়েছে, তারপরও মেসেজটা পড়ে মনে হল মন একটা পাথর সরে গেছে। তবে মেয়েটা এত সুন্দর মনের মানুষ ভেবে খুব দুঃখ হল। কতজনে এত বন্ধুসুলভ হতে পারে? আর আমি কিনা এই মেয়ের উপর হাত তুলেছি ভেবেই খারাপ লাগল।
এর মেসেজের একটা সুন্দর জবাব দিব বলে ভাবছিলাম। কিন্তু সুন্দর কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। তাই ভাবতে ভাবতে রাত কাবার।

চার

পরদিন স্কুলে একটু দেরি করেই গেলাম। ক্লাসেও প্রবেশ করালাম স্যার ঢুকার সাথে সাথে। ইচ্ছে করেই করেছিলাম। পাছে ঐ মেয়ে যদি রাস্তায় ধরে কিংবা ক্লাসে সবার সামনে চর মারে। ভেবেই শিহরিত হলাম। বলা তো যায় না মানুষের মন। কখন যে পরিবর্তন হয় স্বয়ং গণকও বলতে পারবেনা। তাছাড়া বইয়ে পড়েছি সকল মানুষের মন প্রতিশোধ পরায়ন। সুতরাং ও যে প্রতিশোধ নেবে না তার কী গ্যারিন্টি আছে(?!)

ক্লাসে বসেও কোন কোন দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম না । যদিও ঐ মেয়ের পেত্নি মূর্তির পরিবর্তন ঘটেছে কিনা তা দেখার ইচ্ছা করছিল। কিন্তু প্রতিশোধ পরায়ন দুটি চোখ দেখতে পাব বলে সেদিকে তাকানোর আর দুঃসাহস করলাম না। তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, এই মেয়ের আর দুই জনমেও ঝগড়া করব না। ও চাইলেও না,পারলে বন্ধুত্ব করে ফেলব।

নিশি গনিতে ভাল ছিল। কারো কোন অংক করতে কিংবা বুঝতে হলে সে সব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারত। তাই অংকের ব্যাপারে সবাই ওর দ্বারস্থ হতো । তাই ভাবলাম, অংকের ছুতো দিয়ে ওর সাথে কথা বলে আসি।অংকটা যদিও আমি পারতাম তারপরও ক্লাসে ফাঁকা আওয়াজ ছেড়ে বললাম,"
অনুশীলনী দশের ছয় নম্বর অংকটা কারো করা থাকলে দিলে উপকার হতো।"

আমার কথার প্রতিত্ত্যুরে ও বলল,"এই অংকটা কেউই করেনি একমাত্র তোর খাতায় আছে।"

আমি কনফিডেন্ট নিয়েই বললাম,"কে বলল আমার খাতায় করা আছে?"

ও বেশ নমনীয় হয়েই বলল,"সে আর বলতে হয়না। সবাই জানে আজ অংক ক্লাস হবে না । দেরী করে আসায় তুই ঘোষনাটা শুনতে পাসনি।"

সত্যিই তো আমি জানতামই না যে আজ অংক ক্লাস হবে না। ওর কথায় সবার সামনে বেশ লজ্জাই পেলাম। তবে এই মেয়ের দৃষ্টিশক্তি দেখে অবাক হলাম। বিচক্ষণ বলা যায় । ভবিষতে ভাল গোয়েন্দগিরি করতে পারবে।

তবে যা ভেবেছিলাম তার কিছুই হয়নি দেখে খুশিই হলাম। ওর কারণে হলেও নিউটনের তৃতীয় সূত্র ব্যর্থ হয়েছে। ওর আমার প্রতি কোন আক্রোশ তো নেই-ই উল্টো দু'জনে ভাল বন্ধু হয়ে হয়ে গেলাম। টিফিন পিরিয়ডের আগে নিঃশঙ্কোচে ওর সাথে মিশে গেলাম। যদিও প্রথমে তুই-তুমি নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল কিন্তু ওর দেখা দেখি নিজেও তুই করে বলে ফেললাম। ওর সাথে বন্ধুত্ব করার আগে মেয়েদের সাথে যে, বন্ধুত্ব করা যায় সে বিষয়ে ধারণাই ছিল না। আর যারা করত তাদের আতেঁল বলেই মনে হতো।

টিফিন পিরিয়ডের পরে বিখ্যাত বিষু স্যারের গনিত ক্লাস হয়। কিন্তু আজ গনিত ক্লাশ হবে না আমার মতো ভাবুক কবির অজানা থাকলেও সবার জানা ছিল। গনিত ক্লাসে এলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় হেডস্যার। ওনার মত মানুষ পাওয়া আসলে দুষ্কর। একেবারে মাটির মানুষ। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধনে ওনি সম্মানের সাথে একেই স্কুলে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। স্যার ক্লাসে প্রবেশ করার পর অনিক আমায় খোঁচা দিয়ে বলল, "জানিস নিশি আমাদের হেডস্যারের নাতনী"। কথাটা শুনে কেমন যেন আতঁকে উঠলাম । স্যার যদি জানতেন তার নাতনীর গায়ে হাত তুলেছি তাহলে অবস্থাটা কী হতো (!?) নির্ঘাত টিসি হয়ে যেত। মনে মনে ভাবলাম, এমন ভাল মানুষেরই এমন ভাল নাতনী হয়।

হেডস্যার ক্লাসে এসেছেন আমদের বার্ষিক-ক্রিয়া প্রতিযোগিতা নিয়ে কথা বলতে। স্যার বললেন, "শিক্ষকদের অনুরোধে এবার বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় একটা নতুন ইভেন্ট যোগ হবে। এতে অংশগ্রহন করবে ছাত্র শিক্ষক সবাই। ছাত্র শিক্ষদের ভিতর প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। স্কুলে সিনিয়র হিসেবে তোমাদের ক্লাস থেকেই দল বাছাই করা হবে।" উল্লাসে সবাই হাত তালি দিতে লাগলাম।
স্যার আরো বললের,"তোমাদের ভিতর থেকে একজন দাঁড়াও যে দলের ভাল ক্যাপ্টিনসি করতে পারবে। "

সবাই জানে আমি ভাল ক্রিকেট খেলি, তাই ক্যাপ্টিন হলে আমাকেই হতে হবে। তাছাড়া এলাকার ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব তো আমিই দেই। তাই সগর্বে দাড়িয়ে গেলাম। কিন্তু আমার সাথে আর একজন দাঁড়ালো, ইভটেজার রকি। যে কিনা ইভটিজিংয়ের জন্য পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছিল।" আমি একজন ইভটেজার" লেখা সাইন বোর্ড ওর গলায় ঝুলিয়ে প্রুরো এলাকা ঘুরানো হয়েছিল।তারপরও দমে যায়নি, নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে স্বগর্বে।
স্যার একটু ভেবে বললেন,"এক দলে তো দুই ক্যাপ্টিন হতে পারে না । তাই তোমরা (সকল ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে) যে যাকে সাপোর্ট কর তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। "
হায় অল্লাহ! আমার ভাগ্যে যে এই হাদারামগুলি পড়বে তা জানলে কখনই ক্যাপ্টিন হবার দুঃসাহস দেখাতাম না। আধাপাগল অনিক, আতেল জনি, চিকা ইরফান, বোবা শামসু, ক্ষুদ্র বালক সিদ্দিক----- এরা নাকি আমার দলের খেলোয়ার ! আর আমি যে মেয়েদের ভিতর এক জনপ্রিয় আজ তা জানতে পারলাম। তাছাড়া মেয়েরা ইভটেজারকে সাপোর্ট করবেই বা কেন? ছেলেদের সাথে মেয়েরাও তাদের ক্যাপ্টিন বাছাই করে নিল। এ ব্যাপারে মেয়েদের উৎসাহ দেখে স্যার বললেন,"আরে! তোমরাও খেলবে নাকি?" এ কথা শুনে ছেলেরা সব হাসতে লাগল।
কিন্তু আমাদের হাসিকে তুচ্ছ করে নিশি বলল,"জ্বি স্যার আমরাও খেলব।"
স্যার ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিয়ে বললেন,"ঠিক আছে, তোমাদের দু' দলের ভেতর অন্তত তিনজন মেয়ে রাখবে। আর দু দলের ভিতর যে চ্যাম্পিয়ন হবে সে দল খেলবে টিচারদের সাথে ফাইনাল ম্যাচ।"
এ ঘোষণায় ছেলেরা কেমন যেন বিমর্ষ হলো। মেয়েদের সাথে খেলতে হবে বলে কেউ কেউ উৎসাহই হারিয়ে ফেলল। ধর্মভীরু নাহিদ 'নাউযুবিল্লাহ' বলে বুকে থুতু থুতু দিয়ে বসে পড়ল।
ছুটির পর সবাইকে বটতলায় অপেক্ষা করতে বললাম, দল বাছাই করব তাই। স্কুলের টিউবওয়েলে পানি খেতে গিয়ে দেখা হল ফয়সালের সাথে। মাথায় আবার ব্যান্ডেসও করা। ও সব সময় আমার গুনগ্রাহী হয়েও কেন ইভটেজার রকির দলে গেল ব্যাপারটা বুঝলাম না।
ওকে বললাম,"কিরে তুই মেয়ে পাগল রকির দলে গেলি যে!"
ও কেমন যে অবাক হয়ে বলল,"সত্যিই কী আমি রকির দলে গিয়েছি?"
 "বেশি ঢং করবি না, মনে হয় কিছুই জানিস না ! ঐ ইভটেজারটা তোকে কত টাকা দিয়েছে?"
" আসলে কাল রাতের ঘটনার পর মাথাটা কেমন যেন গোল বেধে আছে! কী করি কিছুই বুঝতে পারি না! "

"কাল রাতে কী হয়েছিল?"
"ও তোকে তো বলাই হয়নি, আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। আমার সখের ব্যাটটাও ভেঙ্গে ফেলেছে। টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে যাহোক কিনেছিলাম।"

" ব্যাট ভাংলো কেমন করে?"
"কী বলব দু:খের কথা, আমার মাথায় বাড়ি দিয়েই ব্যাটটা ভাংলো। ঘরে টাকা পয়সা যা ছিল সব নিয়ে গেছেরে। আমরা ফকির হয়ে গেছিরে, শিশির।"
"থাক থাক, আর দুঃখ করিসনে। যা হবার তো হয়ে গেছে। কিপটের ধন কী আর বেশী দিন থাকে রে?" বলে চলে আসলাম। ফয়সালের বাবা যা কিপটে, আল্লাহ হয়ত ফেরেস্তা পাঠিয়েছে কিপটের ধন নিতে।

বট বৃক্ষের নিচে সবাইকে বেশ আগ্রহ নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখলাম। মেয়েদের ভেতরও উৎসাহের কমতি নেই। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে সর্বমোট তেরজনের একটা দল তৈরী করলাম। আজ থেকেই প্রাকটিস শুরু করব বলে বিকেলে সবাইকে মাঠে আসতে বললাম। বিকেল বেলা মেয়েদের খেলা দেখে মনে হলো, ক্রিকেট একটা তামাসার খেলা। আসলে যার কাজ যা নয় তাকে দিয়ে তা করানোই মুশকিল। মেয়েদের দিয়ে কখনো ক্রিকেট হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। যদিও ইদানিং মেয়েদের ক্রিকেট দলই বেরিয়েছে। নিজেদের ভেতর খেলে ভাল করলেও ছেলেদের অনুর্ধ-১৭ এর সাথে খেলে তো চব্বিশ রানেই অলআউট হয়।
আমাদের দলে যে মেয়ে গুলো আছে তো খেলা পারবে না, উল্টো আমাদের খেলা ভুলিয়ে ছাড়ছে। এদের বাদ ও দিতে পারছিনা তাহলে হয়তো আমাদের টিমই বাতিল হয়ে যাবে। ভালই ফ্যাসাদে পড়া গেল। অগত্যা বিপদে পড়েই রাত দিন খেটে এদের খেলা শেখাতে হচ্ছে। তবে ওদের ভিতর উৎসাহ থাকাতে ব্যাপারটা কিছুটা হলেও সোজা হল।
আর একদিন পরেই রকিদের টিমের সাথে আমদের খেলা। স্যারদের সাথে ফাইনাল খেলতে হলে ওদের সাথে আমদের জিততেই হবে। ওদের টিম আমাদের থেকে শক্তিশালী । আদনান, জোবায়ের , হামিদ, মিরাজ আর আতিকের মতো ঘাঘু খেলোয়ার ঐ টিমে আছে। আর আমার টিমে আছে যওসব জ্ঞানী-গুনীর দল। অনিককে শট শেখাতে গেলে ও বলবে,"বিজ্ঞানের সূত্রকে যদি আমরা কাজে লাগাই তাহলে আমরা খুব সহজে জিততে পারি। এ ক্ষেত্রে প্রাসের সূত্র সর্বোত্তম। আমরা যদি বলকে ৪৫° কোণে মারি তাহলে সেটা ছক্কা হতে বাধ্য। অভিকর্ষ বলকে কাটাতে হলে বলকে অনেক দ্রুত কাজ করতে হবে।"
তখন আমি বললাম, "হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছিস। মাঠে নামার সময় চাঁদা আর পেন্সিল কম্পাস নিয়ে যাস। তারপর বলারকে বলবি, ভাই একটু দাঁড়ান হিসাব করে নেই।"
ও তখন আহলাদে গদগদ হয়ে বলল, "বাহ্ তোর বুদ্ধিটা তো খারাপ নয়।"
আরেকজন আছে কবি মজনু। কারো কিছু দেখলেই গলা উচিয়ে স্বরচিত নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে-

" হে তরুণ, জাগিয়াছ পৃথিবীর বুকে
তুলিয়াছ ধার
কেন মানিবে হার
কার আছে হিম্মত, তোমায় আজি রুখে।
আজিকার বায়ু
বাড়ায়েছে আয়ু
বিজয় রবি দেখিতেছি তব মুখে।"

পাঁচ

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে প্রাকটিস করতে সবাই মাঠে চলে আসলাম। পুরো একাদশ আমাদের ঠিক করা আছে। সিদ্দিক আর আঁতেল জনিকে এক্সট্রা খেলোয়াড় হিসাবে রাখলাম। বলা তো যায়না, কার কখন কী বিপদ ঘটে। এ কয়েকদিনে মেয়েগুলোও ক্রিকেকটাকে বেশ ভালো রপ্ত করে নিয়েছে। অনেক ছেলে থেকেও ভাল খেলছে ওরা। নিজেদের প্রমাণ করার চেষ্টা আছে। ওদের এমন ভাব যেন, সুযোগ পেলেই দেখিয়ে দিতে পারে!

ইভটেজার রকিদের সাথে খেলা শুরু হতে বেশি দেরি নেই। এর আগে গা গরম করার চেষ্টা করছি। দলের সবাই কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাসী। এত ফলতু খেলোয়াড় পেয়ে আমি তো পুরো হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। একমাত্র নিশি আর অনিকের উৎসাহে সবাইকে নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কিছু হলেই নিশি বলত, "চিন্তা করিসনা আমরাই জিতব। ইভটেজার দল কি কখনো জিততে পারে? এমন ছক্কা মারব না, যুবরাজের রেকর্ড ভেঙ্গে দিব।" এমন কথায় কি হতাশ হওয়া যায় বলো?

খেলা শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে খবর পেলাম তুরাব খেলতে পারবেনা। বর্তমানে হাসপাতালে আছে। কথাটা শুনে পুরো আতঁকে উঠলাম। ওর উপরই আমার ভরসা ছিল সবচেয়ে বেশি। আমাদের হার্ড-হিটার ওপেনিং ব্যাটম্যান ছিল একমাত্র ওই। বলিষ্ট দেহ তাই দাঁড়িয়ে একের পর এক ছয় মারতে পারে। খবর নিয়ে জানতে পরলাম ডাকাতের আক্রমনে ওর এ অবস্থা হয়েছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে বলে জানা গেল। অবস্থা খুব ঘোরতর বলেই মনে হলো। সব জায়গায় শুধু ডাকাত আর ডাকাতের উৎপাত! তুরাবের এই দুরাবস্থার কথা শুনে খেলা থেকে মনটাই সরে গেল। আজকের খেলাটা কোন রকমে শেষ হলেই যেন বাঁচি! শুধু আমার নয় সবার মনই মোটামুটি খারাপ হয়ে গেল।

তুরাব না থাকলে কী হবে ম্যাচ তো আমাদের শুরু করতেই হবে, তাই তুরাবের বদলে ক্ষুদ্র বালক সিদ্দেককে একদশে নিতে হলো। এটাই বোধ হয় সাপে বর হল!

রকিদের ও বেশ কনফিডেন্ট মনে হলো। ওদের এমন ভাব যেন আজ আমাদের গুড়িয়ে দেবে। তুরাব নেই দেখে ওদের ভাবটা যেন আরো বেশি। তবে যারা খেলা দেখতে এসেছে তাদের ভেতর কয়েকজন দেখলাম, " বি যধঃব বাঃবংবৎচ লেখা প্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর রকি এদের তাড়ানোর কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করল। মেয়েরা এতে বেশ মজাই পেল।

কয়েন দিয়ে আম্পায়ের টস করলেন, টসে ওদেরই জিত হলো কিন্তু আমাদের ব্যাটিংয়ে পাঠালো। আমি আর অনিক ওপেনিং এ নামলাম। 'রিক্শা এক্সপ্রেস' খ্যাত আতিক বল করল। এত স্লো বল যে ছয় হাকাতে গিয়ে কট বিহাউন্ড হলাম। একেবারে ডাক মেরে মাঠ ছাড়তে হল। বিপরীত দলের খেলোয়ারদের খুশি যেন ধরে না। পূর্ব পরিকল্পনা মত নিশি নামল। বুদ্ধিমান মেয়ে ছোট ছোট শট খেলে রানের চাকা সচল রাখল। আর অনিক মনে হল প্রাসের সূত্র ভালভাবে কাজে লাগাচ্ছে। এই দুজনকে নিয়ে একটু ভরসা পাওয়া গেল। ওরা যত রান করছে আমার নিজের লজ্জা তত বাড়ছে। তবু ফপর দালালির মত ভাব বজায় রাখলাম।

কিন্তু খেলা বেশিদূর এগোল না, দশ ওভারে পঞ্চাশ রান করে সবাই সাজ ঘরে ফিরে আসল। অনিক আর নিশি আউট হওয়ার পর একজনও খুব একটা সুবিধা করতে পারল না। আর আমাদের দলের সুন্দরী বালিকা স্বর্না তো পুরো অজ্ঞান হয়ে মাঠ ছেড়েছে। এত জোরে বল আসতে দেখে বেচারি প্রথমে ভড়কে গিয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় বলে অজ্ঞান। আমি একে দলে চাইনি কিন্তু অনিক তুরাবের জোরাজুরিতে

নিতেই হল। অর কবি মজনু তো নামার আগেই আউট। কবিতা আবৃতি করে নামতে নামতে ওর খুব দেরি হয়ে গেছে। আর তাতে আম্পায়ার মহাশয় ক্ষুব্দ হয়ে নামার আগেই আউট ঘোষণা দিলেন।

এবার আমাদের বলিংয়ের পালা। বঙ্গদেশের সমস্ত বোঝা আমার উপর পড়েছে বলে মনে হল। টম ক্রুজের 'মিশন ইমপসিবলকে' কি ভাবে পসিবল করা যায় তাই ভাবতে লাগলাম। কিন্তু আমি যখন ইমপসিবলকে পসিবল করার চিন্তা করছি সে সময় বিপরীত দলের নুজাইম চিকা ইরফানের বলে একের পর এক বাউন্ডারী, ওভার বাউন্ডারী মেরে বঙ্গদেশের বোঝা আরো বাড়াতে লাগল। ইচ্ছা করছিল চাট্টি মেরে একে মাঠ থেকে বিদায় করি।
সৈন্য সামন্ত দিয়ে যদি কাজ না হয়, তাহলে স্বয়ং রাজাকেই যুদ্ধে নামতে হয়। তাই বীরদর্পে বল হাতে নিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত গর্বকে আঙ্গুল দেখিয়ে প্রথব বলেই বাউন্ডারী হাকাল রকি। না আর সয্য করা যায় না। সীতার বনবাস হলে হবে তাই বলে এদের ছেড়ে দেয়া । সমস্ত রাগ বলের উপর ছুঁড়ে 'ইভটেজার নিপাত যাক' বলে মারলাম বল। বল এত জোরে গেল যে, বলের আঘাতে বেচারা রকি ইনজুরি প্রাপ্তি হয়ে সোজা ট্যাম্পের উপর গিয়ে পড়ল। সবাই আউট আউট বলে লাফিয়ে উঠল। আর আমি রাবন বধের মতো উল্লাস করলাম। একটাকে শুধু বধ করলে তো হবে না। আরো সাত্ সাতটাকে বধ করতে হবে তবেই তো শান্তি। উইকেট সহজে না পড়লেও রান নিতে দিলাম না ।

অঘটন ঘটা ছাড়া আমাদের জয় অসম্ভব। তাই ভেবে, মজনুকে বল করতে বললাম। ও বল হাতে আম্পায়ারকে দেখিয়ে বলল, "এই বেটা যদি কলা গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকলে বল করি কেমন করে? আর এদের দরকারই বা কি? কতবার বল গেল একবারও তো ধরল না।"
আমি বললাম,"বুঝেছি, তোর আর বল করতে হবে না। ওখানে গিয়ে পারলে কবিতা আবৃতি কর'আকাশে ছুড়েছি বল, পেয়েছি সুগন্ধি মল' তাও ভাল।"
মজনুর চিন্তা বাদ দিয়ে নতুর আরেকজনকে খুঁজলাম। ক্ষুদ্র বালক সিদ্দিককে দিয়ে কাজ হবে বলে মনে হল। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা সিদ্দিকের হাতে বল দেখে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিল।
আমি একে সাহস দিয়ে বললাম," যা তুই বল কর।"
আমার ভরসায় সিদ্দিক বল করতে গেল। একেই বলে অঘটন। শেষ পর্যন্ত সৌমিক আর সিদ্দিকের স্লো বলে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা কুপোকাত হল। রকিব মুখটা দেখলাম আবু কাবলির মতো হয়ে গেছে। একে দেখলে আমার একটা কথা মনে পড়ে,"দুর্জন সুন্দর হইলেও পরিত্যাজ্য।"এর চেহারা মোটামুটি সুন্দর হলেও, ব্যবহার পুরো কুকুরের মতো।
শেষ পর্যন্ত কাদের জয় হল সে তো বুঝতেই পারছ। তোমরা হয়ত বলবে একটু সিনেমাটিক হয়ে গেল না? এই দেখ, আমি যদি সাদামাটা কিছু লিখে যেতাম তাহলে কী সেটা গল্প হতো আর আমার লেখার উদ্দেশ্যও বৃথা হতো । ইভটেজাররা কেমন করে জিতবে বল, আল্লাহও যে এদের দয়া করবে না। দেশে ইভটেজাররা কী পরিস্থিতি তৈরি করেছে সে তো তোমরা ভাল করেই জানো। ইভটেজারদের বিরুদ্ধে অবশ্যই সবার রুখে দাঁড়াতে হবে।
খেলায় জিতে আমরা সিদ্দিককে ঘিরে আনন্দ করতে লাগলাম। ইচ্ছে হল একে ঘাড়ে তুলে নেই। তাই সোল্লাসে তোলেও নিলাম। সিদ্দিক লম্বায় খাটো হলে কী হবে, ওজন আছে বেশ। আর তাতেই তো ঘাড়ে

ভীষণ চোট খেলাম। ঘাড়টা ভেঙ্গে গেল কিনা বুঝতে পারলাম না। তবে বাকা ঘাড় আর সোজা করতে পারলাম না। আমার ঘাড় বাকা দেখে নিশি জিজ্ঞাসা করল,"কিরে ঘাড়ে কী হয়েছে?"
আমি বললাম, "মনে হয় ঘাড়টা মচকে গিয়েছে। সোজা করতে পারছি না।" আমার কথা শুনে নিশি হাসতে লাগল। আমার দুঃখে এমন হাসি দেখে বেশ রাগ হল।
আমি ঘাড় ধরে বেশ রাগ দেখিয়েই বললাম, "এতে হাসার কী আছে?"
সেই মুখ কেলানো হাসি দিয়ে ও বলল," ঘাড় মচকালে কেউ বাঁচে নাকি? তোর ঘাড় জিনে না ভূতে মচকিয়েছে?"
দুঃখের সময় এমন মজা কয়জনের সয্য হয় জানি না কিন্তু আমার সয্য করতে হল কারণ আগেই প্রতিজ্ঞা করেছি ঝগড়া করব না।

ছয়

ঘাড় সোজা করার যে কত পদ্ধতি আছে আমার ঘাড়টা বাকা না হলে জানতাম না। আর তা যে কখনো-সখনো অপরাধের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত হয়ে থাকে তাও হয়ত জানা হত না। আমি ঘাড়ের ব্যথায় মরছি আর একেক জন এসে একেক রকম উপদেশ দিতে লাগল।

লাজ-লজ্জা অপমানহীন রনি বলল,"ঘাড়ে ব্যাথা খুব সিরিয়াস ব্যাপার রে। খুব সহজে সারে না। আমার দূর সম্পর্কের নানীর ছেলের মার তোর মতোই ঘাড়ে ব্যথা হয়েছিল। দুই বছরেও সারেনি। তবে মোটা তক্তা দিয়ে যদি ঘাড়ের উপর ইচ্ছেমত গণদোলাই দেয়া যায় তাহলে সারতেও পারে।"

এ কী কথা! গণদোলাই দিলে যদি ঘাড়ের ব্যথা ভালই হতো তাহলে চোর-ডাকাতদের আর ঘাড়ে ব্যথা হতো না।

ধর্মভীরু নাহিদ সদ্য গজানো দাঁড়িতে হাত ভোলাতে ভোলাতে বলল,"হুম! ঘাড়ের ব্যথা তো? কোন ব্যাপার না। কাল তুই আমার সাথে কাশুগঞ্জের ল্যাংটা বাবার কাছে যাবি দেখবি এক ফুতে কম্ম সাবাড়। ঘাড়ের ব্যথা বাপ বাপ কইরা পালাইব।"

বিপক্ষ দলের তোফা বলল, "সব চালিয়াতি সাজা! শুধু ঘাড় না আল্লায় তোর মাথাও খাইব।"

আমি বললাম, "চালিয়াতি কিরে?"

তোফা মুখটা বানরের মতো করে বলল, "চালিয়াতি করে জিতেছিস আবার কথা বলছ!"

ছেলেগুলো যে কী, হেরে গেলেই বিপক্ষ দলের এই দোষ সেই দোষ খুঁজে। একদম বাংলাদেশের রাজ নৈতিক দলের মতো। এজন্যই জাতির আজ এ করুণ অবস্থা।

অনিক আর নিশি বলল, ওরা হাসপাতালে তুরাবকে দেখতে যাবে। আমাকেও যেতে বলল। প্রথমে রাজি হলাম না পরে ঠিকই ওদের পিছু পিছু সিদ্দিককে সাথে নিয়ে গেলাম। যাওয়ার সময় একটা ডিসপেনসারিতে জিঙ্গেস করলাম, ঘাড় ব্যথার কোন ওষুধ আছে কিনা?

কী নির্মম! এই ব্যথার নাকি কোন ওষুধই নেই। ছিঃ ছিঃ করতে লাগলাম, আমাদের বিজ্ঞান এত পিছিয়ে। আরেকটা ডিসপেনসারির দোকানি মুভ না পাওয়ার বম্ভ কী মলমের কথা বলল! কিন্তু ওসব মলম-ফলমের প্রতি আমার মোটেও বিশ্বাস নেই।

একঘন্টা কী দেড় ঘন্টার ভিতর হাসপাতালে পৌঁছে গেলাম। হাসপাতালের গেইটে একটা মেয়ে দেখে ভীষণ ভড়কে গেলাম। সেই সাথে আমার ঘাড় ব্যথাটাও ভাল হয়ে গেল। মেয়েটা লম্বায় কমপক্ষে ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি তো হবেই! এত লম্বা মেয়ে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। এর জন্য ছেলে পাবে কোথায় তাই ভাবলাম!

তবে মেয়েটা আমার তো করলই সাথে মানব জাতির একটা ভীষণ উপকার করল! কারো আমার মতো ঘাড়ে ব্যথা হলে এই মেয়ের সামনে আনলে নির্ঘাত ঘাড়ের ব্যথা ফিনিস হয়ে যাবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে হলে ঘাড়ের ব্যথা এমনিতেই ফিনিস হয়ে যাওয়া কথা। মেয়েটার মাথায় আবার ব্যান্ডেজ করা! নিশ্চয় না দেখে ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে এই হাল হয়েছে। লম্বা মানুষের বুদ্ধি কম হয় তুরাবকে দিয়ে আমি জানতাম, আজ ব্যাপারটা নিশ্চিত হলাম।

নিশিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই ওই মেয়েটাকে চিনিস?"

"তাল গাছের মতো যে লম্বা, ওইটা।"

"হে, ওইটা।"

"একে না চিনার কী আছে! এ তো আমাদের স্কুলেই পড়ে। দুনিয়া শুদ্ধ লোক জানে, এ বাংলাদেশের সবচেয়ে লম্বা মেয়ে। কেন, তুই একে চিনিস না।"
এর মধ্যে অনিক বলল, "ওর কথা বলিস না ও কিছুই চিনে না।"
কথাটার অবশ্য প্রতিবাদ করতে পারলাম না। কারণ আমি কী জানি বা চিনি সেটা আমি নিজেও বলতে পারব না।
হাসপাতালের দুই তলায় করিডোরের শেষ মাথায় তুরাবের কেবিন পেয়ে গেলাম। বেচারার একেবারে নাজেহাল অবস্থা করে দিয়েছে। শরীরে এখানে সেখানে ব্যান্ডেজ করা। প্যান্টটাও ঠিকমত পড়তে পারছে না। নিচের অংশ চাদর দিয়ে ঢাকা। তুরাবের মা ওর পাশে বসা ছিল, আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। তুরাব মনে হল ঘুমিয়ে আছে।
নিশি তুরাবের মাকে জিজ্ঞাসা করল,"আন্টি এখন কী অবস্থা?"
আন্টি ঘোমটা টানতে টানতে বললেন,"কী আর অবস্থা। সবই ভাগ্যির ব্যাপার মা। তারে কতবার কইলাম যাইস না বাপ যাইস না, কোন কতা শুনলনি!"
কিছু মানুষের স্বভাবই এমন বিস্তারিত না বলে মজা পায় না। তুরাবের মায়ের স্বভাবটাও তেমন, ইতিহাস না টানলে যেন কথা সম্পূর্ণ হয় না। এ কথা সে কথার পরে মূল কথায় আসে।
এবার অনিক জিজ্ঞাসা করল, "আন্টি ওর শরীরের ব্যাপারে ডাক্তার কী বলেছে?"
তুরাবের মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "ডাক্তার আর কী কইব। শীঘ্রি শীঘ্রি ভাল হইলে অয়। আল্লায় রক্ষা করছে, হারামজাদারা বেশি জোরে ঘাই দিতে পারে নাই।"
ইতোমধ্যে তুরাব জেগে উঠেল। আমদের দেখে বলল, "কিরে তোরা?"
আমি বললাম,"এই তো তোকে দেখতে আসলাম।"
অনিক জিজ্ঞাসা করল, "কী অবস্থা তোর?"
তুরাব কণ্ঠে উদাস ভাব এনে বলল, "অবস্থা তো দেখছিস-ই ।"
তারপর আবার ইত্তেজিত হয়ে বলল, "শালাদের একবার সামনে পাই। সবগুলোকে মেরে কুত্তো দিয়ে খাওয়াব। একটুর জন্য একটা ডগ সনকে ধরতে পারলাম না।"
তুরাবের কণ্ঠের ঝাঝ দেখে আমার কণ্ঠ থেকেও ঝাঝ বেরিয়ে গেল, "শুধু গলা না চুলও কেটে ছাড়ব। একেকটাকে গাছে উঠিয়ে শাখামৃগ সঙ্গীত শোনাব দেখবি পুরো গ্যাংটাকে নির্ঘাত দুই দিনের ভিতর ধরে ফেলব। তারপর বুঝবে ঠ্যালা।"
তুরাব আমার কথা বিশ্বাস করে বলল, "পারবি তো?"
এর উত্তর কী দেব ভেবে পেলাম না। আমি তো শুধু কথায় তাল মেলানোর জন্য বলেছি। সত্যিই যে ধরে ফেলব তা কে বলেছে! তাই অসহায়ের মতো অনিক আর নিশির দিকে তাকালাম। দুইটা কত বড় স্বার্থপর আমার দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেল।
আমিও ওদের উপেক্ষা করে বললাম, "পারব না কেন? তুই নিশ্চিত থাক। জানিস তো, এই শিশিরের কাছে ইমপসিবল বলতে কিছুই নেই। শালারা বেশি বেড়েছ। একেকটাকে নাকানি চুবানি খাইয়ে ছাড়ব।"
তুরাব 'শাবাস' বলে উঠতে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। তারপর বলল,"আজ খেলার কি খবর? জিতেছিস তো? আমি তো খেলতেই পারলাম না।"
"জিতব না আবার। আজ খেলিস নি তো কি হয়েছে? আসল খেলা তো এখনো বাকি।"
"তা ঠিক বলেছিস। ততোদিনে সুস্থ হতে পারলেই হয়।"

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখলাম, মোটামুটি সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। পাখির কিচির-মিচিরে চারপাশ মুখরিত। সন্ধ্যার পরিবেশটাই অন্য রকম, কেমন যেন উদাস ভাব এসে যায় । মনে পড়ে জীবনানন্দের সেই মহাগোধূলীর কথা-

"সোনালী খড়ের ভারে অলস গরুর গাড়ি-বিকেলের রোদ পড়ে আসে।
কালো নীল হলদে পাখিরা ডানা ঝাপটায় ক্ষেতের ভাড়ারে
শাদা পথ ধূলো মাছি- ঘুম হয়ে মিশছে আকাশে
অস্ত সূর্য গা এলিয়ে অড়ব ক্ষেতের পারে পারে
শুয়ে থাকে; রক্তে তার এসেছে ঘুমের স্বাদ এখন নির্জনে।"

সন্ধ্যার এই নির্মল পরিবেশে এ কী দৃশ্য! দু'জন লোককে মনে হল শ্যামল চাচাদের বাড়ির দিকে দৃষ্টি রাখছে। লোক দুটিকে এ এলাকায় কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। আর এদের হাব ভাবও ভাল ঠেকছে না, কেমন যেন ষন্ডামার্কা চেহারা।
লোক দুটো আমাদের দেখতে পেল বলে মনে হলো। এমন ভাব করল যেন তারা এই পথ দিয়েই যাচ্ছিল, ভুলে ওদিকে একটু দৃষ্টি পড়েছে আর কি! আমরাও এমন ভাব করলাম যেন কিছুই হয়নি। লোক দুটোর যে কোন বদ মতলব আছে সেটা আন্দাজ করতে পারলাম। আমি অনিককে বললাম," আয় তো অনেক দিন মুহিদ ভাইয়ের সাথে কথা হয় না, একটু দেখা করে যাই।" মুহিদ ভাই হল শ্যামল চাচার ছেলে। এলাকার ভিতর তারা খুব অবস্থাপন্ন।
শ্যামল চাচা বাড়ির বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছিলেন। আমাদের দেখে বললেন,"বাবারা কেমন আছ? এই সন্ধ্যাকালে আগমন যে?"
আমি বললাম,"এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম মুহিদ ভাইয়ের সাথে একবার দেখা করে যাই।"
"যাও, মুহিদ ঘরের ভিতরেই আছে। আমি যাই মাগরিবের নামাজটা পড়ি গিয়া।"
আমাদের আর ভেতরে যেতে হল না। মুহিদ ভাই নিজেই আসলেন। মুহিদ ভাইয়ের চেহারা কুশ্রী হলেও, দশজনে একখানা। আমায় দেখে খুব খুশি হলেন বলে মনে হলো। আমার হাত ধরে টেনে তার রুমে নিয়ে গেলেন। বললেন, "একদম ঠিক সময়ে এসেছিস, শিশির। আমি মনে মনে তোর কথাই ভাবছিলাম।"
"হঠাৎ এই অধমের কথা মনে পড়ল যে?" ভাব দেখানোর জন্য মাঝে মাঝে আমি এই কথাটা বলে থাকি।
"আর বলিস না, একটা চিঠি লিখার দরকার ছিল। আর তুই তো জানিস আমার হ্যান্ড রাইটিংয়ের অবস্থা। তোর লেখার একটু শ্রী আছে কিনা, তাই বলছিলাম চিঠিটা লিখে দিতি যদি?"
"কিন্তু মুহিদ ভাই, আমি তো এখন পারবো না। বাড়ি যেতে হবে শীঘ্ঘির।"
"সামান্য একটা কাজ করে দিতে পারবি না।"
"কার কাছে লিখবে?"
মুহিদ ভাই আহলাদে গদগদ হয়ে বললেন, "সে তো তোদের বলা যাবে না।"
অনিক আগ বাড়িয়ে বলল, "নিশ্চয় সার্জিল আপুর কাছে।"
মুহিদ ভাই লজ্জা পেয়ে বললেন, " তোরা তো দেখি বেশি বুঝিস। লিখে দিবি কিনা বল?"
হাতের লেখা সুন্দর হলেও যে মাঝে মাঝে ঝামেলা পোহাতে হয় সে আমি মুহিদ ভাইয়ের কারণে ভাল জানি। সার্জিল আপুকে লেখা ওনার সবগুলো প্রেমপত্র আমার হাতেই লেখা। কাশু খানের বউ প্রিনকির ভাবীর সাথে ওনার পরকীয়া প্রেম ছিল। পরকীয়া প্রেমটা আমি মানতে পারি না, তাছাড়া এটা দেশ ও

দশের জন্য ক্ষতিকর। আর তাই অনেক চেষ্টায় এটা বন্ধ করতে পেরেছিলাম। ওনার বর্তমান প্রেম নিয়ে আমি কিছু বলতে পারি না তাহলে স্বয়ং মমতাজ শাহজাহানকে অবমাননা করা হয়।
আমি কথার মোড় ঘুরিয়ে বললাম, "মুহিদ ভাই, আপনাকে একটা জরুরি খবর দিতে আসলাম। চিঠি না হয় কাল লিখা যাবে। ব্যাপারটা হলো, দু'জন লোক আপনাদের বাড়ির দিকে নজর রাখছিল। আর ইদানিং চোর-ডাকাতের যা উৎপাত বেড়েছে বুঝেনই-তো। সাবধান হয়ে থাকবেন।"
"বলিস কি!" বলে মুহিদ ভাই আতকে উঠলেন।
তারপর আমাদের কিছু না বলেই হর্ হর্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও আর দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।
আমাদের বাড়ির সীমানায় এসে দেখলাম বাড়ির বারান্দায় বেত হাতে নিয়ে আব্বু আমার অপেক্ষায় আছেন। রাম নাম নাকি আল্লাহ জপব তাই ভুলে গেলাম। এইবারের মতো রক্ষা পেলে বাঁচি!

কিন্তু আমারও কী বুদ্ধি কম ! যেমন বেগুন তেমন শুটকি না,না যেমন বাপ তেমন ছেলে। আমার রুমে একটা জানালা ছিল যেটা আমি বিপদের সময় দরজা হিসেবে ব্যবহার করি। জানালার গ্রীলের এক পাট খুলে ব্যবস্থাটা করেছিলাম। কষ্ট হলেও মোটামুটি ঢুকা যায়। শুধু ঢুকলে তো হবে না, আরো কিছু করতে হবে। আমার আব্বু যা চালাক। ভাগ্য ভাল, মিশুটা আমার রুমে একবার ঢু মেরে গিয়েছিল। একে দিয়ে দুটো রসুন আনালাম। তারপর জ্বরের ভান করে পড়ে থাকা।
আব্বু তো প্রথমে বেত নিয়ে মারতে এলেন। তারপর জ্বরে আমার খারাপ অবস্থা দেখে গজরাতে গজরাতে থেমে গেলেন। আমার মনে হল একটু বেশিই অভিনয় করে ফেলেছি। তাছাড়া রসুনে পুরো শরীর গরম হলো না। তারপরও সেদিনের মতো রক্ষা পাওয়া গেছে। তবে একগাদা ওষুধ গিলতে হয়েছে ঠিকই।
বাবাগুলো যে কেন এমন হয়, জানি না। সব সময়ে শাসনে রাখতে চায়। আমরা নিজেরা যে একটু চলতে শিখেছি তা বোঝতেই চায় না। মাসিক 'ভূতের আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গো-রামের' লেখা ছড়াটার কথা মনে পড়ে গেল। বেচারা কত অতিষ্ট হয়েই না ছড়াটা লিখেছিল!
গোরামের লেখা ছড়াটা তোমাদের খুব পড়তে ইচ্ছে করছে তাই না! আর তোমাদের জন্যই লিখে দিলাম-

"আমি যদি বাবার মত হতাম বড়
বাবা হত ছোট্ট খোকা
তবে বাবাকে বলতাম, বাবা তুমি পড়।
পড়া যদি নাইবা শেখা হত
কান ধরে টানতাম অবিরত।
বাবাকে নামতা অ, আ পড়তে দিয়ে
বসে বসে চা খেতাম আমি গিয়ে।
রোজ সকালে বাবকে পাঠাতাম স্কুলে
যদি নাইবা চাইত যেতে
বলতাম, একঘায়ে চামড়া নেব তুলে।
বিকেল বেলা বাব ধরত খেলার বায়না
বলতাম আমার সাথে বাজারে আয়না!
বাবার উপর বাজারের বোঝা ছাপিয়ে

রাগ করলে বলতাম, গেছি হাপিয়ে।
তাহলে বুঝত বাবা, রোজ আমার কত কষ্ট
এভাবেই জীবনটা মোদের হচ্ছে নষ্ট।”

সাত

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে পত্রিকা পড়াটা আমার কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ। কিন্তু এই কাজটাই আমায় প্রতিদিন বাধ্য ছেলের মত করতে হয়। পত্রিকার কোথায় কী লিখেছে আমায় পড়ে শুনাতে হয় আব্বুকে।
আব্বু বলে,"জোরে জোরে পত্রিকা পড়লে নাকি স্পেলিং ঠিক হয়।"
মাঝে মাঝে ভাবি, রবীন্দ্রনাথের বাবাও হয়ত এরকম ধরে ধরে পত্রিকা পড়াত।
পত্রিকার পাতায় আজ একটা রিপোর্ট দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। আমদের শিবপুর নিয়ে বাজে একটা রিপোর্ট ছেপেছে।

শিবপুরে সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি

কুমিল্লা জেলার শিবপুর থানা দিনে দিনে সন্ত্রাসীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। এমন কোন অপরাধ নেই তারা করছে না। ডাকাতি, শিশু নির্যাতন থেকে শুরু করে চোরা-কারবারীও হচ্ছে নিয়মিতভাবে। এ পর্যন্ত সেখানে অসংখ্য ডাকাতিসহ তিনটি খুন ও চারটি ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ধারণা করছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র এ ঘটনা ঘটাচ্ছে। পুলিশের হাজারো তৎপরতার ভিতর অপরাধ চক্র তাদের অপরাধ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের এ ব্যর্থতা সাধারণ জনগণকে ভাবিয়ে তুলছে। জনগণ এ অবস্থার প্রতিকার চায়।

মাঝে মাঝে ভাবি এ দেশে পুলিশরাই বোধ হয় সবচে' বড় অপরাধী। সবার আগে এদের জেলে ঢুকানো দরকার। রিপোর্টটা পড়ে অবশ্য একটা উপকার হল, নিজের ভেতর কেমন যেন ফেলুদা ভাব এসে গেল। মনে হল জেমস বন্ডের মতো কিছু একটা করে ফেলি। কিন্তু এখন কিছুই করা সম্ভব নয়, স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে কিছু একটা করব বলে স্থির করলাম।
আজ দেরি না করে তাড়াতাড়ি স্কুলে চলে এলাম। মাঠের পুবকোণে দেখি ইভটেজার রকি মাথা উঁচু করে কপালে একটা পয়সা রেখে সূর্যের দিকে মুখ করে অসুরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। একে দেখতে অদ্ভুদ লাগছে।
আমায় দেখে বলল, "সাবধান! কাছে মাত আও। পিটিয়ে টেন্ডি বাজাব। শত্রুতা যা হবার পরে হবে। আল্লাহ এইবারের মতো বাঁচাও।"
তারপর বিড়বিড় করে কাকে যেন কী বলল নাকি গালি দিল বুঝলাম না।
পরে জানতে পারলাম কোন মেয়ের উপর যেন কুদৃষ্টি দেয়ার কারণে শফিক স্যার ওকে এ শাস্তি দিয়েছে। ঐ মেয়ে নিজেই নাকি স্যারের কাছে নালিশ করেছে। অমল ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "ইভটিজিংয়ের মতো জঘন্য কাজ করতে তোর লজ্জা লাগে না।"
রকি মুখে প্রেমিকের ভাব এনে বলল,"প্রেম মানে না কোন বাঁধা। প্রেমিক এগিয়ে চলে ঝড়ের গতিতে। তার কোন দিক নেই, সীমা নেই। আর তোদের এসব বলেই বা লাভ কী! তোরা তো এডাল্টই হসনি।"
অমল খোঁচা দিয়ে বলল, "এডাল্ট হইনি তাই রক্ষা। নইলে তোর মতো 'আমি একজন ইভটেজার' লেখা সাইনবোর্ড গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হতো।"

খোঁচাটা ভালই কাজে লাগল কারণ রকির মুখটা একদম পচা আলুর মতো হয়ে গেছে। রকির বাবা-মা ওর নামটা একদম সার্থক রেখেছে, শত লাঞ্ছনা সইবে তবু পাথরের মতো ইভটিজিং ছাড়বে না।

টিফিন পিরিয়ডে সিদ্দিকের কাছে খবর পেলাম ডাকাতরা নাকি শ্যামল চাচাদের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। কিন্তু মুহিদ ভাই লোক নিয়ে রেডি থাকায় ডাকাতরা আর বাড়িতে প্রবেশ করতে পারেনি। উল্টো মুহিদ ভাইয়ের লোকেরা ওদের তাড়া করে গিয়েছিল। সবকিছু ঠিকঠাক ছিল, অল্পের জন্য ধরেও ফেলত। কিন্তু মাঠের ওপারে গিয়ে নাকি চোখের সামনে ডাকাত দল উদাও হয়ে গেছে! ওরা স্পষ্ট ডাকাতদের দেখছিল, কিন্তু চোখের সামনে হঠাৎ যেন মাটি ফুড়ে ডাকাত দল হাওয়া। ঐ জায়গায় অনেক খোঁজাখুজি করেও নাকি ডাকাতদের টিকিটির চিহ্নও পাওয়া যায়নি। ডাকাতদের ভেলকি বাজি দেখে সবাই টাকশি খেয়েছে। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুদ লাগল। এটা কেমন করে সম্ভব, একদল ডাকাত মাটি ফুঁড়ে হাওয়া হয়ে গেছে! জাদু ছাড়া এ কখনো সম্ভব নয়। অনিক বলল, "নিশ্চয় ওরা বানিয়ে বলেছে। আমরা যদি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখি, তাহলেও এর সত্যতা পাওয়া যাবে না। এসব ক্ষেত্রে নিউটন কিংবা আইনস্টাইনের কোন সূত্র আছে বলে মনে হয় না।"
নিশি ওকে থামিয়ে বলল,"তাহলে তুই একটা বানিয়ে নে। মনে হচ্ছে, ডাকাতগুলো কোথাও লুকিয়ে পড়েছিল তাই ওরা ভাবল মাটি ফুঁড়ে চলে গেছে।"
এ সময় অমল বলল, "মাটি ফুঁড়ে চলে যাওযা অসম্ভব নয়! মহাভারতে আছে শ্রী শীতারাণী মাটি ফুঁড়ে চলে গিয়েছিল।এ নিয়ে....."
অনিক একে থামিয়ে বলল, "ইস্ কী একটা পেয়েছে মহাভারত! যার এক পার্সেন্টও বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই।"
অমল রেগে বলল, "দেখ মহাভারত নিয়ে বাজে কথা বলবি না। নির্ঘাত ধ্বংশ হয়ে যাবি!"
"উওফ, তোরা চুপ করবি?" বলে নিশি চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচালে নিশিকে অনেক সুন্দর দেখায়, ব্যাপারটা আমি ভালভাবে লক্ষ্য করলাম। আসলে এক এক মানুষের সৌন্দর্য একেকভাবে ফুটে উঠে।
সবাই চুপ করার পর আমি বললাম, "এখানে বসে আকাশ-পাতাল ভেবে কাজ নেই। পুরো ব্যাপারটি আমাদের তদন্ত করে বের করতে হবে। কোথায়, কী ঘটেছে সব সূক্ষ্মভাবে বিশেলষণ করতে হবে। সব রহস্যের সমাধান ইনশাল্লাহ আমরাই করে ফেলব।"
নিশি আমার চুলগুলো ঝাড়া দিয়ে বলল, "খারাপ বলিসনি।"
চিকা ইরফান ভয় পাওয়ার সুরে বলল,"ডাকাতদের সাথে ফাজলামো করা ঠিক হবে কী?"
মজনু সুর মিলিয়ে বলল,"ঠিক হবে না।"
আমি বললাম, "ফাজলামো কিসের রে? ফেলুদা যে রহস্য উদঘাটর করে এগুলো কি ফাজলামো? শার্লক হোমস কী ভেরেন্ডা ভাজি খাওয়ার জন্য তদন্ত করে। বুকে একটু সাহস রাখতে শিখ। আর এই অকর্মার মতো জীবন রেখে কী করব? শেম্, শেম্। তোদের কাপুরুষতাকে ধিক্কার জানাই। তোরা কেউ যদি এগিয়ে না আসিস তাহলে আমি একাই লড়ে যাব।"
আমার কথায় সবগুলোর টনক নড়েছে বোধ হয়। চিকা ইরফান মুখটা পচা আলুর মতো করে ফেলল। ক্ষুদ্র বালক সিদ্দিক গলা বাড়িয়ে বলল, "কেউ তোর সাথে না থাকুক আমি অন্তত আছি।"
তারপর দেখলাম একে একে সবাই 'আমিও' বলে আমার দলে ভিড়তে থাকে। চার ফুট এক ইঞ্চি বালক সিদ্দিকের সাহস দেখে সবাই হয়ত লজ্জা পেয়ে রাজি হতে বাধ্য হয়েছে।

আমি দলনেতার সুরে সবাইকে বললাম, “শোন বন্ধুরা, আমাদের মাদার ল্যান্ড আজ বিপদের মুখে, ডাকাতের হাতে বিপন্ন।আর জানিস তো, জননী-জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষা মহিয়সী। একে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। আর এ জন্য সমূহ বিপদ মোকাবেলা করতে হতে পারে। প্রয়োজনে কুকুরের কামড় খেতে হবে, স্বর্গে বাসও হতে পারে!”
সিদ্দিকটা বাড়িয়ে বলল,“মহিষের বমি কিংবা ছাগলের ছনাও খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।”
সিদ্দিককে থামিয়ে বললাম,“তো বন্ধুরা, তারপরও আমাদের গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যেতে হবে। আর আজ থেকেই আমাদের ইনভেস্টিগেশন শুরু। এসো সবাই হাত মিলাই।”
মজনু আমায় টেনে নিয়ে বলল,“দেখ তোদের সাথে যোগ দিয়েছি ভাল কথা। কুকুরের কামড়েও সমস্যা নেই কিন্তু মহিষের বমি আর ছাগলের ছনাটা আমার একদম পেটে সয় না।”
আমি হতাশ হওয়ার ভান করে বললাম,“কী আর করা। তোর জন্য তাহলে কুকুরের কামড়ই বরাদ্দ রইল।
”

কথাটা শুনে মজনু খুশিই হয়ে গেল।
টিফিন পিরিয়ডের পর দুটো ক্লাস হয়ে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। নিশি, ঝুমুর, অনিক আর চিকা ইরফানকে পাঠালাম এলাকায় যতগুলো ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে তার তথ্য জেনে আসতে। বিশেষ করে শ্যামল চাচাদের বাড়িতে। আমি, সিদ্দিক, মজনু আর অমল গেলাম মাঠের ওপারে তদন্ত করার জন্য।

আট

মাঠের সীমানা বিশাল। লোকে একে 'পাগল-খাইয়া' নামে ডাকে। কিন্তু কেন ডাকে তা আমার জানা নেই। হয়ত এ মাঠ ধরে ধরে পাগল খেত, তাই এমন হতে পারে। মাঠের ও পাশটা জঙ্গলে ভরা। তবে জায়গাটা চমৎকার। গান ধরার ইচ্ছে জাগে। আমি গান গাইলে আশেপাশে হুলস্থুল কিছু ঘটে যায় ভেবে ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখলাম। মজনুটা দেখলাম ঠিকই ধেড়ে গলায় গান ধরেছে। 'এমন ক্ষণে আইসো বন্ধু, কইব কথা তোমার সনে।' আশেপাশে কুকুর নেই তাই রক্ষা। তারপরও কী উপায় আছে! একদল বানর ভয় পেয়ে বটফল দিয়ে মজনুকে টার্গেট করে ছুড়ে মারল। একটা তো ওর ঘাড়ে বসে দুটো ছাটিই মেরে গেল। মজনু হর হর করে দৌড়ে কোন রকমে বাঁচল। বটফলের টার্গেট আমাদেরও মিস করল না। ভাগ্যিস আমি গান ধরিনি, তাহলে নির্ঘাত আরো ভয়াবহ কিছু ঘটে যেতে পারত।
বটফলের আঘাতে মজনুর কপালের এক পাশ ফুলে গেছে। নতুন শিং গজানোর সময় গরুর যেমনটা হয়। তাই দেখে অমল বলল, "তুই তো গেছসরে মজনু। কয়েকদিন পর শিং গজাবে, তারপর লেজ।"

সিদ্দিক যোগ করে বলল,"ঘাস খাবি আর হাম্বা হাম্বা করে গো সঙ্গীত গাইবি।"

এর ভিতরে মজনুটা আবার কান্নাকাটি শুরু করে দিল। একে নিয়ে তো ভালই ঝামেলায় পড়া গেল। বন্ধুদের তামাশায় কেউ এমন বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদে! আমি একে স্বান্তনা দিয়ে বললাম, "বন্ধুরা তো তামাশা করতেই পারে। তাই বলে কাঁদতে হয় মজনু? ছিঃ ছিঃ মজনু। কাঁদিস না তোর লেজ, শিং কিচ্ছু গজাবে না। তোর ঘাসও খেতে হবে না।"
মজনু মুখটা আলু কাবলির মতো করে বলল, "আমি এ জন্য কাঁদছি নাকি! পায়ে একটা কাচ বিধল তাই।" বেচারা মজনু আবার চেঁচিয়ে উঠল।
নিচে তাকিয়ে দেখলাম আশেপাশে বিস্তর ভাঙ্গা বোতলের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটা বোতল নিয়ে গন্ধ শুকে বুঝলাম, এ আর কিছু নয় পেনসিডিলের বোতল। উপরে লেভেলও লাগানো আছে। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না, আশে-পাশে বাড়ি-ঘর কিছু নেই, নীরব-নিস্তব্ধ পরিবেশে কারাই বা পেনসিডিল খেয়ে মাতাল হয়। পুরো জিনিসটা রহস্যময় হয়ে উঠেছে। জায়গাটা ভাল করে সার্চ না করে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না।

ঝোপ-জঙ্গলে ভরা এ বনের ভিতর চারজন রহস্য উদঘাটনে নেমে পড়লাম। এখানে কাটা গাছের সংখ্যা বেশি। কয়েকটায় লেগে হাত ছিলে গেল। একটা গাছে দেখলাম থোকায় থোকায় ফল ঝুলে আছে। ফলগুলো দেখে জিবে জল এসে গেল। লোভ সামলাতে না পেরে কয়েকটা ছিড়ে নিলাম। মুখে পুরেই ভড়কে গেলাম, এত সুন্দর ফলের এত বিশ্রি স্বাদ হয়!
অমল হাসতে হাসতে বলল,"তুই পাগল হয়ে যাবি। নির্ঘাত পাগল হবি। এটা ডুমুর ফল। ডুমুর ফল খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়।"
আমি বেশ গলা উচিয়ে বললাম,"পাগল হওয়া তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই জগতে পাগল কয়টা আর ভাল মানুষ কয়টা আছে বলত? নিশ্চয় পাগলের সংখ্যা কম। পাগল হতে কপাল লাগে বুঝলি। পাগলের মত চিন্তা-ভাবনাহীন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।"

আরো কতগুলো ডুমুর ফল এগিয়ে দিয়ে অমল বলল, "তাহলে এই নে বেশি করে ডুমুর খা। যদি তোর সৌভাগ্য লাভ হয়।"
সৌভাগ্য লাভের প্রত্যাশায় এই বিশ্রি স্বাদের ফলটা আর মুখে তোলার সাহস হলো না।
এরি মধ্যে সিদ্দিকটা কোথায় যেন অদৃশ্য হল। "সিদ্দিক, খুদে মানব সিদ্দিক" বলে বার বার ফাঁকা আওয়াজ দেওয়ার পরও কোন সাড়া এলো না। তিনজনে মিলে ঝোপঝাড়ে অনেক খোঁজ করলাম। কিন্তু সিদ্দিকের কোন হদিশ মিলল না। তাহলে সিদ্দিক গেল কোথায়? অদৃশ্য হয়ে গেল না তো! কিন্তু ওতো জাদু জানে না।
ক্ষুদ্র মানব সিদ্দিককে খোঁজার ফাঁকে ঝোপের ভিতর একটা কলার ছড়ি আবিষ্কার করল অমল। এখনো পাকেনি তাই উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু মজনুর আর তর সইল না। কাচা কলা পাড়ার জন্য ঝাপিয়ে পড়ল ঝোপের মধ্যে। সাথে সাথে মজনুও অদৃশ্য! ধুপধাপ করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম শুধু। বার বার ডেকেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।
আমি আর অমল কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে রইলাম। আমার বিবেক নাড়া দিয়ে উঠল। আমাদের দুই দুইজন বন্ধু অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর আমারা দাড়িয়ে আছি! নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিলাম। অমলকে বললাম, "যা থাকে কপালে। ওদের না নিয়ে কাপুরুষের মতো ফিরে যাব না। ফিরলে চারজন, না হলে কেউ না। ছাগলের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ঢেড় ভাল।"
"ঠিক বলেছিস।"
দু'জনে প্রচন্ড ভয় কিন্তু দুঃসাহসিকতা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। আশপাশ থেকে এখানে ঝোপঝাড়ের পরিমানটা একটু বেশি। ভেবেছিলাম আশ্চর্যজনক কিছুর দেখা পাব কিন্তু দেখলাম ঝোপঝাড়ের নিচ দিয়ে সুরঙ্গের মত একটা পথ নিচে নেমে গেছে। অমল আমার দিকে চেয়ে বলল, "নামবি?"
আমি খুব প্রত্যয় নিয়ে বললাম, "নামব না তো কী? আমাদের দু'বন্ধু বিপদে পড়ে আছে, সো ঝটপট ঝাপিয়ে পড়।" ঢালু ভেবে দু'জনে ঝটপট নামার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এটা মোটেও ঢালু নয়। একটু ঢালু হয়ে খাদের মত বিশাল গর্ত। উপর থেকে সোজা নিচে পড়ে ভালই ব্যথা পেলাম। অমলটা আবার ঘাড়ের উপর ধপ করে পড়ল। আরো ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম।
গর্ত না সুরঙ্গ এখনো বুঝতে পারছি না। ভেতরে মোটামুটি অন্ধকার। চারপাশে কিছুই দেখা যায় না। তবে কিছুক্ষণের ভেতর অন্ধকারটা চোখ সয়ে এলো। মজনুটাকে গর্তের ভেতর অজ্ঞান অবস্থায় পেলাম। আশেপাশে কোন পানি নেই তাই থুথু ছিটিয়ে একে সজাগ করতে হল। বেচারা সজাগ হয়ে হাউ মাউ করে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। পরে আমাদের চিনতে পেরে কান্নাকাটি বন্ধ করে আমায় দোষারোপ করে বলল, "তোর জন্য আজ এই অবস্থা! গোয়েন্দাগিরি নাকি উজবুকের কান্ডকীর্তি, ঘোড়ার ডিম খোজা।"
"চুপ কর, আমাদের রহস্যের সমাধান এখানেই পেয়ে যেতে পারি।"
"রহস্য না ছাই! এখান থেকে বের হতে পারলে বাঁচি।"
অমল খোঁচা দিয়ে বলল, "বের হতে পারবি না। এই গর্ত বেয়ে উপরে উঠা অসম্ভব। বিকল্প পথ খুঁজতে হবে।"
আমি বললাম,"আমিও তাই ভাবছি। আর এটা কোন গর্ত নয় সুড়ঙ্গ। আশে-পাশে কোথাও জমিদার বাড়ি আছে বলে মনে হয়। চল সামনে যাওয়া যাক্।"
মজনু গো ধরল,"আমি যাব না।"

তাহলে তুই এখানেই থাক, বলে আমরা দু'জন সামনে এগোতে লাগলাম। পরে ঠিকই পিছু পিছু আসল। সুড়ঙ্গটা অনেক পুরনো দিনের মনে হচ্ছে। কোথাও কোথাও সুরঙ্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ভে ঙ্গ পড়ে আছে। ক্রমে পুরনো দিনের ইতিহাসে ঢুকে পড়ছি বলে মনে হল। ক্রমশ অন্ধকার হাতড়ে কোন রকমে পথ চলছি। আমাদের ভিতর একজন সিগারেটখোর থাকলে মন্দ হতো না! তাহলে অন্তত একটা লাইটার পাওয়া যেত। যদিও মজনু কবিতার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে দু-একটা টান মেরে থাকে তবে চেইন স্মোকার নয়। ভাব আনার জন্য ও এ কাজটা করে থাকে।
বাতাসে কেমন যেন একটা কটু গন্ধ টের পেলাম।ইঁদুর আর চিকাগুলো আমাদের সাড়া পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ঐতিহাসিক থেকে ভূতোরে দিকে যেতে লাগল। এক ঝাক চামচিকার উড়োউড়িতে পরিবেশটা আরো ঘোরতর হয়ে উঠল। অমলটা আবার চামচিকাদের পিছু পিছু দৌড় দিল। দৌড়াতে দৌড়াতে বলল,"চামচিকাদের পিছু পিছু গেলে পথ একটা পাওয়া যাবেই। তাড়াতাড়ি দৌড়া। চামচিকারা পথ চেনে।"
আমি বললাম, "চামচিকারা যে পথ চেনে সে পথে তুই যেতে পারবি বলে মনে হয় না। যদি না চামচিকা হস।"
সত্যিই তাই হল। চামচিকা গুলো সুরঙ্গের উপরের সরু ছিদ্র দিয়ে ঠিকই বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে পথে মানুষের যাওয়া অসম্ভব। মজনু আর অমল দুটোকে হতাশ মনে হল।

সিদ্দিককে নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তা হলো। বেচারা যে কোন বিপদে পড়েছে! অবশ্য আমরাও কী কম বিপদে আছি ? যতদূর ভাবছি সব জঘন্য লাগছে। কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদের মতো সিদ্দিকও সুড়ঙ্গ বন্দী। এখান থেকে উদ্ধার পাওয়াই এখন আসল কাজ।
মজনু বলল, "কবরে এর থেকেও বেশি অন্ধকার হবে নাকি রে?"
"আমি মরে কবরে গিয়েছি যে জানব কবরে কেমন অন্ধকার!" খুব রাগ নিয়েই উত্তরটা দিলাম।
অমল বলল, "নিশ্চয় এ সুরঙ্গে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে।"
"আমিও তাই ভাবছি। একবার ভেবে দেখ তো, ডাকাতগুলো সবার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যায়, এটা কীভাবে সম্ভব? এতগুলো মানুষের চোখকে ফাঁকি দেয়া সোজা ব্যাপার না!"
মজনু ফ্যাকাশে গলায় বলল, "সব ভেলকি বাজি। নিশ্চয় জাদু জানে। এই জাদুতে আমরাও আটকে গেছি।"
"না মোটেও তা নয়। পুরো ব্যাপারটার সাথে সুরঙ্গ জড়িয়ে আছে। দেখি কতদূর সত্য হয়।"
অমল ভয় পাওয়া কণ্ঠে বলল, "তুই কী গরুর ডাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস?"
মজনু তামাশা করে বলল, "তোর বোধ হয় গরু রোগ হয়েছে তাই গরুর আওয়াজ শুনতে পাস।"

কিন্তু একটু পরে আমি শুনলাম ছাগলের আওয়াজ। মজনু শুনল ভেড়ার ডাক। আশেপাশে কোথাও গরুর হাট আছে নাকি! সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে গরু বাজারে ঢুকে পড়ছি কিনা সন্দেহ হল। গরু ছাগলের আওয়াজ ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু মানুষের কণ্ঠও শুনতে পেলাম। ভয় আর উৎকণ্ঠায় সামনে এগিয়ে চললাম।

অমল আর মজনুকে সাবধান করে দিয়ে বললাম, "বিড়াল হয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর। একটা শব্দও যাতে না হয়। দরকার হলে জুতো খুলে ফেল। কাশি আসুক আর পিঁপড়ে কামড়াক না কেন, কোন শব্দ করা যাবে না। ধরা পড়লে জান নিয়ে ফিরতে পারবি না!"
মজনুটা এমন সিরিয়াস কথার ভিতরেও বলল, "জান-প্রাণ দরকার নেই এই হাত নিয়ে ফিরতে পারলে হয়। তাহলে অন্তত কবিতা লিখে জীবনটা পার করতে পারব।"
মজনুর এই আবেগী কথা শুনে মনটা পুরো পানিভাত হয়ে গেল। কিন্তু কাজের সময় অনুভূতির কোন দাম নেই তাই ব্যাপারটা মুহূর্তে ঝেড়ে ফেললাম।
অমলটা আবার দলনেতার ভান করে বলল, "বন্ধুরা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এই পথে পা বাড়িয়েছি তা ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও....."
কথাটা শেষ করতে দিলাম না। মাথায় দুটো চাটি মেরে বললাম, "তোরা রক্ত দিলে দে আমি পারব না। রক্ত দিলেও কাজ হবে না। সে রক্ত বৃথা যাবে। যা করার বুদ্ধি দিয়ে করতে হবে।"
আমার কথা শুনে অমলের ভাব পুরো মাটি হয়ে গেল।
ছাগল আর গরুর আওয়াজ ধরে সামনে এগোতে লাগলাম। যেতে যেতে সামনে পড়ল ত্রিমুখী সুরঙ্গ, তিন দিকে তিন মুখ গিয়েছে। কোন দিকে যাব দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ে গেলাম।
অমল বলল,"তিন জন তিন দিকে গেলে কেমন হয়?"
মজনু বলল,"না, ভাই আমি একা যেতে পারব না। কোথায় কোন বিপদে পড়ি কে জানে।"
আমি বললাম,"তিনজন আলাদা না হওয়াই ভাল। একজনকে হারিয়েছি আর কাউকে হারানো যাবে না। নাক বরাবর রাস্তা দিয়ে চল। আর গরু ছাগলের হাট সামনেই মনে হচ্ছে।"

নাক বরাবর সোজা নিঃশব্দে হেঁটে গেলাম। কিন্তু সামনে গিয়ে যা দেখলাম তাতে অবাক, বিস্ময়, হতবাক হয়ে গেলাম!

নয়

সুড়ঙ্গের ভিতর বিশ্ববিদ্যালয়! নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর সুড়ঙ্গ! অদ্ভুদ ব্যাপার! বই পত্রেও তো কোনদিন পড়িনি এই এলাকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু চোখের সামনে তো সাইনবোর্ডটা ঠিকই জ্বলজ্বল করছে। “ টহরাবৎংরঃু ভড়ৎ ঃযরবভ ধহফ ৎড়ননবৎ (বি ঃবধপয যবৎব বাবৎু ংুংঃবস ড়ভ ৎড়ননবৎু ধহফ মরাব ধ ফবমৎবব.) সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আবার কত ডিপার্টমেন্টে ভাগ করা। ছোট ছোট কামড়া করে এক একটা ডিপার্টমেন্টের নাম দেয়া আছে। ‘কিলার ডিপার্টমেন্ট’, ‘ধান্দাবাজ ডিপার্টমেন্ট’, ‘চাপাবাজ ডিপার্টমেন্ট’, ‘স্পাই ডিপার্টমেন্ট’.......আরো যে কত ডিপার্টমেন্ট আছে আড়ালে থাকার কারণে বলতে পারলাম না। চোর ডাকাতরাও যে ইউনিভার্সিটি খুলে শিক্ষিত হচ্ছে তা কে জানত!

অমল খুব খুশি হয়ে বলল, “আয় ভার্সিটি এলাকাটা ঘুরে আসি। ভাল জায়গা মনে হচ্ছে। আমার ভাইয়ের ভার্সিটিতে কত গিয়েছি। ভার্সিটি অনেক ভাল জায়গা, এখানে চোর ডাকাত থাকে নাকি! আয় তো।”

“থাকে না, কচু। তোদের মত অর্ধেক পড়ুয়াদের জন্য দেশের আজ এ অবস্থা। শুধু ইউনিভার্সিটি দেখে লাফাচ্ছিস। এটা যে সে ইউনির্ভাসিটি নয়, চোর-ডাকাতদের ভার্সিটি। আমাদের দেখতে পেলে, শত্রু ডিপার্টমেন্টে ঢুকিয়ে চ্যাংদোলা করবে।”

“খুব সিরিয়াস ব্যাপার তো।”

“শুধু সিরিয়াস না এর থেকেও বেশি। এখন কী করা যায় ভাবছি।”

এর ভিতরে মজনু জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা ঐ গরুগুলো কেন? চোর-চেচ্চরদের ভার্সিটি বুঝলাম কিন্তু গরু ছাগলের হাট কেন?”

“এই জিনিসটা এখনো তোর মাথায় ধরেনি। ঐখানে যত জিনিসপত্র দেখছিস সব চুরির মালপত্র। গরু চোররা গরু, ছাগল চোররা ছাগল, পাতা চোররা পাতা এনে এখানে জমা দেয়।”

“তুই এত কিছু জানলি কেমন করে?”

“দৃষ্টি প্রসারিত কর তাহলে তুইও সব বুঝবি।” কথাটা বেশ ভাব নিয়েই বললাম।

আড়াল থেকে দেখলাম দু’জন লোক কাকে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। গলাটাও পরিচিত ঠেকছে। লোক দুটোকেও কোথায় যেন দেখেছি, ঠিক মনে পড়ছে না।

অমল আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, “সিদ্দিকটা ধরা পড়ে গেছে। সর্বনাশ! আমাদের কথাও বলে দিবে। আজ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব না মনে হচ্ছে। হে মা কালী, দুগ্‌গা, বাবা গণেশ রক্ষা কর।”

“নিজের কথা বাদ দিয়ে সিদ্দিককে কিভাবে উদ্ধার করা যায় ভাব। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, এর জন্য একজনকে ধরা দিতে হবে। তোদের দুটোকে দিয়ে কাজ হবে না তাই আমিই ধরা দিব। এই ফাঁকে যেভাবেই হোক পালিয়ে যাবি। সাবধান, কোনভাবেই যেন ধরা না পড়িস্। এলাকায় গিয়ে বাকি সবাইকে খবর দিয়ে পুলিশ নিয়ে আসবি। ওকে, বেঁচে থাকলে দেখা হবে, নইলে এটাই শেষ দেখা।” শেষ কথাটা বলতে খুব কষ্ট হল।

মজনু দরদ দেখিয়ে বলল,“ধরা পড়লে তুই একা পড়বি কেন? আমরাও পড়ব। তুই কি আমাদের কাপুরুষ ভেবেছিস। আমার কী সাহস নেই! তুই আমার সাহস দেখতে চাস। দেখবি?”

কী আর বলব, মজনুটা এত গাঁধা চোর-ডাকাতদের হেড অফিসে গিয়ে হম্বিতম্বি শুরু করে দিল। আমরা টেনেও ধরে রাখতে পারলাম না।দেখলাম যে, চোর-ডাকাতদের ছাত্র শিক্ষক সবাই মজনুটাকে ঘিরে ধরেছে।

আর মজনু গলা হাকিয়ে বলছে, “আমার সাহস নেই, না। জান-প্রাণ এগুলো আমরাও দিতে পারি। একটু বোকা হতে পারি কাপুরুষ নই।”
এই ফাঁকে আমি আর অমল একটু পিছিয়ে ত্রিমুখী সুড়ঙ্গের বা পাশের মুখ দিয়ে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে একটা পথ অবশ্য পেয়েও গেলাম। তবে বা পাশে নয় ডান পাশে । এই পথটা চোর-ডাকাতরাও ব্যবহার করে বলে মনে হয়। কারণ আশেপাশে অসংখ্য পায়ের চাপ। পাহারাদারও থাকতে পারে। অসম্ভব নয়! হয়ত ঝামেলা শুনে ভিতরে গিয়েছে। এই সুযোগে আমরা সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসলাম। মনে হল যেন, কবরের শাস্তি থেকে পালিয়ে বাঁচলাম। কী বিদঘুটে সুড়ঙ্গ, বাইরে থেকে একটুও বোঝার উপায় নেই। জায়গাটাও যে কোথায় আন্দাজ করতেও পারলাম না। কোথা দিয়ে ঢুকলাম আর কোথা দিয়ে বেরিয়ে আসলাম!
“অমল, তাড়াতাড়ি দৌড়া। আশেপাশে যেখানেই পুলিশ স্টেশন থাক্ না কেন শীঘ্রি ইনফর্ম করতে হবে। একটুও টাইম লচ করা যাবে না।”

দু’জনে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিলাম দৌড়। দৌড় দিলে কী হবে, আমাদের পিছু পিছু আরো দু’জন লোক দৌড়ে আসল। নিশ্চয়, আমাদের ধরার জন্য!

দশ

লোক দুটো যে আমাদের থেকে ভাল দৌড়াতে পারে তা নয়। কিন্তু এমনভাবে দৌড়াতে থাকলে এক সময় যে ধরা পড়ব তা নিশ্চিত। দৌড়ানো অবস্থায় অমলকে বললাম, "এভাবে দৌড়ে পারা যাবে না। দুই জন দুই দিকে দৌড়াতে হবে। সাবধান! ধরা পড়ার চেষ্টাও করবি না। পারলে কোথাও লুকিয়ে পড়িস।"
"আমার জন্য চিন্তা করিস না। তুই দৌড়া। আমি ১৫০০ মিটার চ্যাম্পিয়ন।"
দু'জন আলাদা হয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করলাম। লোক দুটোও ভাগ হয়ে আমাদের পিছু ছুটল। প্রচন্ড তেষ্টা পাচ্ছে, এক ফোঁটা পানি পেলে অমৃত মনে হত।এক সেকেন্ডও থামার সুযোগ নেই।

মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি এল! একটা সিনেমায় নায়ককে কাজটা করতে দেখেছি। এক ঝাপ ঝোপের ভিতর লুকিয়ে গাছে উঠে গেলাম। গাছের উপর নিজেকে এমনভাবে আড়াল করলাম যেন লোকটা দেখতে না পায়। আশেপাশের ঝোপঝাড় উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খুঁজে হতাশ হয়ে লোকটা ফিরে গেল। এতক্ষণ পর মনে হল আত্মায় পানি পেলাম। আজ মনে হল,আমার সিনেমা দেখা সার্থক!
চারপাশে চোখ রেখে খুব সতর্কভাবে গাছ থেকে নেমে এলাম। প্রচন্ড পিপাসায় দৌড়াতে ইচ্ছে করছে না তারপরও সব তুচ্ছ করে দৌড়াতে লাগলাম। শেষে এই এলাকার মূল সড়কে পৌঁছে গেলাম। দু'একটা রিক্সা ছাড়া রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা।
নিজেকে ক্লান্ত কুকুরের মতো মনে হচ্ছে। জিহ্বা বের করেই হাপাতে লাগলাম। কিছু লোক অবাক হয়ে আমায় দেখে আবার নিজের পথ হাটতে লাগল। রাস্তার বা পাশে খাল ছিল। কোন কিছু বিবেচনা না করে খালে নেমে একরাশ ময়লা পানি খেয়ে নিলাম। পিপাসা যে কত তীব্র হতে পারে, আজ তার বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো। জীবনে কখনো খালের পানি ছুয়েছি কিনা জানি না, আজ খেতেই হলো!
এখনো অনেক কাজ বাকি তাই সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই।
একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাই এখান থেকে পুলিশ স্টেশন কতদূর হবে?"
লোকটা কতক্ষণ আমার দিকে চেয়ে বলল, "এক দেড় মাইল তো হবেই।"
হেটে কাজ হবে না। রিকশা, টেম্পুর খোঁজ করলাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম দুটো দশটাকার নোট আছে। তাই দিয়ে এক রিক্সাওয়ালাকে রাজি করালাম। রিকসা দ্রুত থানার দিকে চলতে লাগল। রিকসায় উঠে একটু স্বস্তি পেলাম। তবে ওদের তিনজনকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। অমলটা কী ধরা পড়ল? মজনু আর সিদ্দিকের কী অবস্থা? বেঁচে আছে তো? হাজারটা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তারপরও মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করলাম।
আধাঘন্টার ভিতর থানায় পৌঁছে গেলাম। পুলিশ স্টেশনের অবস্থা একেবারেই বেহাল। সামনের সাইনবোর্ডের অনেক লেখা মুছে গেছে, সাইনবোর্ডটাও ঝুলে পড়েছে। বিল্ডিংয়ের ইটগুলোর অবস্থা জীর্ন-শীর্ন বুড়োর মতো। মাঠে দুটো গরু আর কয়েকটি ছাগল চড়ে বেড়াচ্ছে। দু'জন লোককে খাকি প্যান্ট আর সাদা গেঞ্জি পড়ে থানার বারান্দায় লুডু খেলায় মগ্ন দেখলাম। লোক দুটোকে তোয়াক্কা না করে থানার ভেতরে ঢুকে গেলাম। একজন বোধ হয় ডাকার চেষ্টা করল কিন্তু না শোনার ভান করলাম।
থানার ওসি টেবিলের উপর মাথা রেখে খুব আরাম করে ঘুমুচ্ছিলেন।
"অফিসার, তাড়াতাড়ি উঠেন, খুবই জরুরি কাজ"- ডেকে জাগিয়ে দিলাম।

অফিসার মহাবিরক্ত হয়েছে বলে মনে হল। খুব তেড়ে গলায় বলল,"কী হয়েছে শুনি? এত হরফর কিসের। আমার কাঁচা ঘুমটাই ভেঙ্গে গেল! হাসু, জগা তোরা কী করছিস। ছেলেটা ঢুকল কীভাবে?"

ডাকাডাকি শুনে বাইরে বসে থাকা লোক দুটো ভিতরে ঢুকল। বুঝলাম এরাও পুলিশের লোক। হাবিলদার হবে হয়ত। এদের একজনের নাম হয়ত জগা, আর একজনের নাম হাসু।
আমি পুলিশ অফিসারকে বললাম, "অফিসার, আমার কথাটুকু একটু শুনুন। বিশাল বড় একটা কান্ড ঘটে গেছে।"
তারপর একে একে সব ঘটনা খুলে বললাম অফিসারকে। এত সিরিয়াস কথা শুনেও অফিসারের চেহারার কোন পরিবর্তন হলো না। বিশ্বাস করেনি বুঝতে পারছি।
উল্টো বলল, "দেখ, ছেলে এই বয়সে তোমাদের লেখা পড়া করার সময়। আজগুবি কাহিনী বানিয়ে পুলিশকে বোকা বানাতে এস না। জেলে পুরে দিলে তামাশার মজা বুঝতে পারবে।"
"বিশ্বাস করুণ, আমার তিন বন্ধু এখনো ওদের হাতে বন্দি। ওদের উদ্ধার করতে হবে।"
ধরেই নিলাম অমল ওদের হাতে ধরা পড়ে গেছে।
পুলিশ অফিসারের নাম নান্নু। জানই তো পুলিশের নাম জানা সবচে' সোজা। অফিসার চেয়ার দুলিয়ে বললেন, "মাসুদ রানা আর তিন গোয়েন্দা পড়ে ছেলেদের মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সব ছেলে নিজেদের গোয়েন্দা ভাবে। শোন বাচা, তোমার বয়সে আমি কম দুষ্ট ছিলাম না। কত গাছের আম চুরি করেছি আর কত লোককে যে ঠ্যাঙ্গিয়েছি তার কোন ইয়ত্তা নেই। মাঝে মাঝে গোয়েন্দা সেজে সবার সাথে বাহাদুরিও কম করিনি। যাও বাড়ি গিয়ে মন দিয়ে পড়ালেখা কর।"
"পিল্‌জ অফিসার, আমার কথা বিশ্বাস করুন।"
"বিশ্বাস তো করলাম-ই।"
"তাহলে আমার সাথে চলুন।"
"যাও গিয়ে ওদের পাহারা দাও আমরা রেডি হয়ে আসছি।"বলে তিনজনে হো হো করে হেসে উঠল।

প্রচন্ড রাগে গা ঝা ঝা করতে লাগল। মাথাটাও খুব ধরেছে। কে ধরেছে বলতে পারব না! লোকে বলে তাই আমিও বললাম। বাড়ি ফিরে যাওয়ার মনস্থির করলাম। অনিক নিশিদের সাথে দেখা করে যা করার করতে হবে। আগের রিকসাওয়ালাকেই পেয়ে গেলাম। পেসেঞ্জার পায়নি বলে কোথাও যায়নি। এই রিকসাতেই বাড়ির পথে রওনা হলাম।

এগার

অনিক, নিশি, আর ইরফানকে একসাথে পেয়ে গেলাম। ওরা আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। আমার বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল। রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদায় করে দিল অনিক। কোন বিশ্রাম না নিয়ে ওদের সব খুলে বললাম। আমার কথা শুনে ওদের হতাশ মনে হলো।
নিশি বলল, "তোরা তো সব রহস্য উদ্ধার করে ফেলেছিস। আমাদের আর দরকার কি ?"
"এখন তোদেরই দরকার সবচেয়ে বেশি রহস্যেও ফিনিশিংটা তোদেরই দিতে হবে। আর দেরী করার সময় নেই, কিছু একটা কর। "
অনিক বলল, "বেঈমান কোথাকার, আমাদের মুহিদ ভাইয়ের কাছে প্রেমপত্র লিখতে পাঠিয়ে নিজেরা রহস্য সমাধান করে এসেছিস!"
"সময় নষ্ট করিসনা। ভাব, কিভাবে পুলিশ ডেকে ওদের তিনজনকে উদ্ধার করা যায়। এমনিতে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। শয়তান গুলো গাঁ ঢাকা দিতে পারে। "
নিশি বলল, "পুলিশ যখন তোর কথায় সাড়া দিল না। আমাদের উচিত অভিভাবক কারো সাহায্য নেয়া।"

ইরফান বেশ উৎসাহে বলল, "এক্ষেত্রে আমাদের হেডমাষ্টারই সর্বোত্তম। ওনি ছাড়া আর কেউ রাজি হবে না। "
"ঠিক বলছিস। আমরা সবাই মিলে বললে দাদু কিছু একটা করতে পারে।"
আমি বললাম, "ওকে কুইকলি।"
হেডস্যার ইজি চেয়ারে বসে আরাম করে বই পড়ছিলেন।
আমাদের দেখে অবাক হয়ে বললেন, "এই অসময়ে তোমরা? কোন ঝামেল মনে হচ্ছে?"
নিশি বলল,"ঝামেলা মানে বিশাল বড় ঝামেলা। তোমাকে হেল্প করতে হবে। আমাদের তিন বন্ধু মহাবিপদে।"
"কী হয়েছে খুলে বল তো, মা!"
নিশি সবিস্তারে একে একে সব কথা বলল। আমার দুঃসাহসিকতার কথা বলতেও ভুল করল না, গর্বে আমরা বুকটা একহাত উঁচু হয়ে যাচ্ছিল। বুকটা উঁচু হয়ে যাওয়ার করনেই বোধ হয় বুঝলাম প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। কিংবা স্যারের সামনে রাখা আপেলগুলো দেখে! স্যারও বোধ হয় আমার খিদেটা বুঝলেন তাই আমায় খেতে দিলেন। কারো চেহারার দিকে না তাকিয়ে একাই সাবাড় করে গেলাম। চেহারার দিকে তাকালে যদি মায়া হয় তাহলে তো ভাগ দিতে হবে!
স্যার অবলীলায় আমাদের সব কথা বিশ্বাস করলেন। পুলিশ অফিসারের কান্ড শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। সাথে সাথে ফোন করলেন ওসিকে এবং এক্ষুণি আসতে বললেন। কিছুক্ষণের ভিতর গাড়িসহ পাঁচজন পুলিশ এসে হাজির। পুলিশ অফিসার মিঃনান্নু আমায় দেখে যেন কেমন করলেন।
তারপর বললেন, "স্যার,আপনিও এই বাচ্চা পোলাপানদের কথা বিশ্বাস করেছেন?"

স্যার বললেন, "তোমার দায়িত্ব হচ্ছে অপরাধীকে ধরা এর জন্য যা কিছু করার তোমার করতে হবে। এখন তোমার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের সাথে যেতে হবে। আমার তিনজন ছাত্রকে উদ্ধার করতে হবে।"
স্যারের কথায় পুলিশ অফিসার মি. নান্নুর মুখটা কালো হয়ে গেল।
তারপর কাচুমাচু করে বললেন,"স্যার আপনি যা বলেন।"
ব্যাটা এতক্ষণে লাইনে এসেছে।
স্যার আমায় বললেন,"শিশির, তুমি আমাদের ঐ জায়গায় নিয়ে চল।"
"তবে চলুন, স্যার।"স্যারসহ আমরা পুলিশের জিপে গিয়ে বসলাম। পুলিশের জিপটা চলতে লাগল পাগলখাইয়া মাঠের দিকে।
যেতে যেতে স্যার বললেন,"আজ থেকে অনেক বছর আগে, এই গ্রাম থেকে সাত ক্রোশ দুরে শ্যামা আলী খায়ের জমিদারি ছিল। অত্র এলাকায় তার ভীষণ দাপট ছিল। তবে অন্যান্য হিন্দু জমিদারদের মতো অত্যাচারী ছিলেন না। ইসলাম খাঁ যখন বাংলায় আসেন তখন শ্যামা আলীর প্রাসাদে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। শ্যামা আলীর প্রাসাদও ছিল বিশাল। আশেপাশে যত সুড়ঙ্গ পাওয়া যায় সব শ্যামা আলীর প্রাসাদ থেকে বেরিয়েছে।" আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে স্যারের কথা শুনছিলাম।
পুলিশ অফিসার মি.নান্নু স্যারের সাথে যোগ দিয়ে বললেন,"শ্যামা আলীর রাজত্ব বেশিদিন টিকেনি। আশেপাশের হিন্দু জামিদাররা একজোট হয়ে তাকে তাড়িয়েছিল। শ্যামা আলীর কর্মচারী এনামূল শাহ ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল। শ্যামা আলী সুড়ঙ্গ দিয়ে কোথায় পালিয়েছিল কেউ তার হদিশ দিতে পারে না। "
আমি বললাম, "চোর ডাকাতরা এখন এই সুড়ঙ্গে আস্তানা গেড়েছে। ডাকাতির পর ওরা মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। ডাকাতগুলো পালানোর পথ হিসাবে এই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করে।"
আমার কথার কেউ কোন জবাব দিল না ।
নিশি জিজ্ঞাসা করল, "শ্যামা আলীর প্রাসাদ কী এখনো আছে?
স্যার বললেন, "সব ধ্বংশ হয়ে গিয়েছে। লুটপাটেরা একটা ইটও বাকি রাখেনি।"

বার

পাগল-খাইয়া মাঠের শেষ সীমানায় এসে জীপটা থেমে গেল। একে একে সবাই জীপ থেকে নেমে এলাম। আমি সবাইকে পথ দেখিয়ে সুড়ঙ্গের যে মুখ দিয়ে আমি আর অমল লুকিয়ে এসেছিলাম সে জায়গায় নিয়ে গেলাম। কিন্তু মুখটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই যে কাজটা করা হয়েছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পুলিশ অফিসার বলল,“ মনে হচ্ছে মাটি চাপা দিয়ে অপরাধীরা পালিয়েছে। ”
আমি বললাম,“ভিতরেও থাকতে পারে। আমি আর একটা পথ জানি, আসুন দেখি ঐ পথটা ব্যাবহার করে ঢুকতে পারি কি না?”
স্যার বললেন ,“ ঐটাও যদি বন্ধ করে দেয়।”
“মনে হয় না ওটা বন্ধ করা সম্ভর।”
মজনু কলা পাড়তে গিয়ে যে জায়গা দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়েছিল আমি ওদের ওখানটায় নিয়ে গেলাম। আমি এখানকার অবস্থা আগের থেকে জানি। তাই আমার নামতে অসুবিধা হলো না। বাকি যারা নামল ঠ্যালাটা বুঝে গেল। স্যারকে নামতে নিষেধ করলাম। স্যার উপরে আমদের অপেক্ষায় রইলেন।

পুলিশ অফিসার আমদের উপর মহা বিরক্ত। কাজ ফাঁকি দেয়া লোকদের এই স্বভাব। যখন কাজ এসে পড়ে তাদের চেয়ে অখুশি আর কেউ হয় না। ভাগ্যিস, পুলিশওয়ালারা টর্চলাইট নিয়ে এসেছিল, তাই আগের মত কবরের অন্ধকারে পথ চলতে হয়নি। ত্রিমুখো সুড়ঙ্গে পৌছে নাক বরাবর চলে চোর ডাকাতদের বিশ্ববিদ্যালয় পৌঁছে গেলাম। চোর ডাকাতদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের ডিপার্টমেন্ট দেখে সবাই পুরো থ বনে গেল। আমি একবার থ বনে গেছিলাম, তাই দ্বিতীয়বার থ বললাম না। শুধু ভাব নেয়ার চেষ্টা করলাম। পুলিশ অফিসার মুখটা কাচু মাচু করে বলল,“অথচ আমরা এর কিছুই জানতাম না। ইউনিভার্সিটি খুলল একবার অনুমতিও নিল না। ”
চোর ডাকাতদের ছাত্র শিক্ষক সব পালিয়েছে তাই জায়গাটা শূণ্য, নীরব। গরু, ছাগলগুলোও নেই। পুলিশের সাথে আমরাও বিভন্ন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে তল্লাশি চালালাম। ওদের জিনিসপত্র সব ঠিক আছে শুধু লোক নেই।
একজন হাবিলদার সাইজের পুলিশ বলল, “স্যার, কারো কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। সব পালিয়েছে। ”
আর একজন বলল, “কাল সকালে পুরো এলাকায় তদন্ত করা যাবে।”
অনিক সন্দেহের সুরে বলল, “আচ্ছা সুড়ঙ্গের ভিতর কী সুড়ঙ্গ থাকতে পারে না। যেমনটা ঘরের ভিতরে ঘর থাকে। ।”
আমি বললাম, “এখন তামাসা করার সময় নয়। যা বলার স্পষ্ট করে বল। ”
ও আবার বলল, “সবাই একটু এদিকে আসুন। যা ধারণা করছি তা সত্যিও হতে পারে।”
তারপর দেখলাম ও একটু লাফানোর চেষ্টা করল।
আমরা ওর কাছে গেলে বলল, “এই জায়গাটার ভিতরে ফাঁকা মনে হচ্ছে। একবার লাফিয়ে দেখুন মনে হবে এর নিচে কোন খালি জায়গা আছে। এখানে দরজাও থাকতে পারে। এখানকার মাটিটাও আলগা লাগছে।”
সত্যিই তাই হল, উপরের মাটি আস্তে সরিয়ে দেখা গেল একটা দরজার মতোন, নীচ থেকে বন্ধ।
অনিকের বুদ্ধিতে সবাই চমকিত হয়ে গেলাম। আনন্দে একে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু সবাই যখন আমার

দিকে তাকিয়ে থাকল,তখন বুঝলাম এটা অনিক নয় নিশি ছিল। কিছুক্ষণের জন্য হলেও বেকুব বনে গিয়াছিলাম।

পাঁচজন পুলিশ খুব সতর্ক হয়ে গেল। দরজার দিকে অস্ত্র তাক করে রইল। মি. নান্নু আমাদের সরে যেতে বললেন। অনেক চেষ্টায় দরজাও ভাঙ্গা হল। ভেতরে যারা ছিল উপরে ফাকা গুলি চুড়ে মারল। কেউ উকি দেয়ার সাহসও পেল না। পুলিশ অফিসার মি. নান্নুকে যতটা বোকা ভেবে ছিলাম ততটা নয়। মাথায় ভাল বুদ্ধি রাখে।

একটা দড়ির মাথায় কি যেন একটা বেধে গর্তের চোর ডাকাতদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমি এখন টাইম বোমা ফেলব। দুই মিনিটের ভেতর যদি বেড়িয়ে না আসিস তাহলে সবগুলো মারা পড়বি।"

গর্তের ভেতর থেকে একজন বলল, "অফিসার বোমা তোলে নিন। আমরা শিক্ষক মানুষ, এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না, আত্মসমর্পণ করছি।"

একজন একজন করে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসল। এদেরকে গ্রেফতার করা হল। সিদ্দিক আর মজনুকে জীবন্তই পাওয়া গেল তবে বিবস্ত্র অবস্থায়। এ অবস্থা কেন হল জিজ্ঞাসা করার সময় পাইনি। অমলকে ডাকাতরা ধরতে পারেনি তাই এখানে পাওয়া গেল না। পুলিশ অফিসার বোমা বলে যা ছুড়ে মেরেছিলেন আমরা পরে তা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম আসলে তা ছিল সামান্য একটা অ্যালার্ম ক্লক।

মি. নান্নু লজ্জিত হলেও আমার উপর খুব খুশি। বলা যায় না, ওনার প্রমোশনের জন্যও খুশি হতে পারেন। তবে আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। আব্বুর কাছে একগাদা গুনগানও করলেন যা আব্বুর মোটেই পছন্দ হয়নি।

যাওয়ার সময় বরলেন, "তোমার কথা আমার আগেই বিশ্বাস করা উচিত ছিল। খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। যা দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছ সত্যিই তুলনা নেই। তোমার জন্য পুরো অপরাধ চক্রটা ধরা পড়ে গেল। দেশের মানুষ তোমার দুঃসাহসিকতা ভুলবে না।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "এ আর এমন কী!"

কিন্তু অমল কোথায়?পাগল খাইয়া, ছাগল খাইয়া সবজায়গা খোঁজ করা হয়েছে কোন হদিস মিলল না। একেও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। আমার রুমে এসে আরামসে ঘুমুচ্ছে। ডেকে দিয়ে বললাম, "তুই পুলিশকে খবর দিয়েছিস?"

আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল, "আসলে আমি ভুলে পোষ্ট অফিসে চলে গিয়াছিলাম। আর সেখানে পুলিশ না পেয়ে তোর সাথে পরামর্শ করতে তোর রুমে চলে আসলাম। তুই দেরী করলি বলে ঘুম দিলাম। "

" গাঁধা কোথাকার, পোষ্ট অফিসে কী তোর দাদা পুলিশ রেখেছে।"

" দাদার কথা আসছে কেন? পুলিশ তৈরীর আগেই তিনি গত হয়েছেন।"

" তোর গাফলতির কারণে আমরা তিন জন তো মারাও পড়তে পারতাম।"

" সে আমি জানি, তুই সব সমলে নিবি।"

এমন তেল মারা কথা বললে আর কিছু বলা যায় বলো? তাই আমিও চুপ হয়ে গেলাম।

তের

পরদিন 'ভাতের জোরে' পত্রিকায় চার কিশোরের দু:সাহসিক অভিযান নামে বড় করে গল্পাকারে একটা প্রতিবেদন ছাপা হলো। আমার কথাই বেশী লেখা হয়েছে। এটা দেখে অনিক, নিশি , ঝুমুর, স্নিগ্ধরা ইর্ষায় জ্বলে গেল, ওদের কথাও লিখছে কিন্তু তেমন ভাবে নয়। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় এ নিয়ে রিপোর্ট ছেপেছে।
আমরা যখন পত্রিকার রিপোর্টগুলি পড়ছি তখন সিদ্দিক এসে খবর দিল,"আজ তো স্যারদের সাথে ক্রিকেট ম্যাচ, খেলতে যাবি না?"
"আরে তাই তো, ভুলেই-তো গিয়েছিলাম।"

ব্যাট বল নিয়ে রেডি হয়ে সবাই মাঠে রওনা হলাম। রাস্তায় বেড়িয়ে দেখলাম মানুষজন আমায় অন্য চোখে দেখছে। নিজেকে কেমন যেন নায়ক নায়ক মনে হলো। পাশে একটা নায়িকা থাকলে মন্দ হতো না!
মাঠে গিয়ে দেখি সবাই রেডি, খেলার শুরুতেই টচ হল। টচে জিতে আমি ব্যাট করতে নেমে গেলাম। খেলোয়াড়ি পোষাকে স্যারদের অদ্ভুদ লাগছে। টি-শার্টের নিচ দিয়ে শফিক স্যারের বিশাল ভূড়িটা বেড়িয়ে আসছে। ক্যাপ দিয়ে রেজা স্যারের টাক ঢাকার আপ্রাণ চেষ্টা!

পেরেগ স্যার চিকন লিকলিকে দেহটা নিয়ে বল করতে আসলেন । আমিও জোরে ব্যাট চালিয়ে দিলাম। কিন্তু শফিক স্যারের ভুড়িতে লেগে বলটা থেমে গেল। ক্যাচটাও অবশ্য ফসকালেন।এক রান নিয়ে শান্ত থাকতে হল।এবার স্ট্রাইকে গেল অনিক। ব্যাটে বলে ভালই মিলাল কিন্তু সর্বভুকখ্যাত গণেশ স্যার সেটা মুখে পুড়ে নিলেন। বলটা তার মুখে এমনভাবে সেটে গেল যে অনেক চেষ্টা করেও বের করা গেল না! বল মুখে নিয়ে স্যারকে পুরো হা হয়ে থাকতে হল। আর তুরাবও আউট হয়ে গেল।

নতুন বল আনা হল। দ্বিতীয় ওভারে আমি আবার স্ট্রাইকে গেলাম এবং রীতিমত বল আসল। দিলাম ব্যাট চালিয়ে, বলও ফড়ফড় করে উড়তে লাগল। বাউন্ডারিতে ছিলেন বিষু স্যার, যাকে কিনা আমরা যমের মত ভয় পাই। বলটাও কেমন পাজি, স্যারের টাকের উপর পড়ে অভার বাউন্ডারী হয়ে গেল।
স্যার প্রচন্ড রেগে একটা স্ট্যাম্প তুলে রীতিমতো আমার তেড়ে এসে বললেন, "তবে রে আমার টাক সই করে মারা হচ্ছে!! "
আমি আর কি করি ব্যাট হাতে দিলাম দৌড়!

বইটি ফেব্রুয়ারী,২০১১ বইমেলায় অমর প্রকাশনী হতে প্রকাশিত।
আমার আরো লেখা পড়তে যান-
Arafatmunna.blogspot.com

আপনার মতামত জানান-
arafatmunna@gmail.com